শ্রীমদ্ভাগবত

প্রথম স্কন্ধ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রথম স্কন্ধ

"সৃষ্টি"

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

ভগবৎ ধর্মের আদর্শ প্রচারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী,
মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্যসহ ইংরেজি
SRIMAD BHAGABATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলিকাতা, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

PTP DAS MAYAPUR

প্রথম অধ্যায়

ঋষিদের প্রশ্ন

শ্লোক ১

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**— পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবায়**—(বসুদেবের পুত্র) বাসুদেবকে, অথবা আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে; **জন্ম-আদি**—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়; **অস্য**—প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **অন্বয়াৎ**—সরাসরিভাবে; **ইতরতঃ**—ব্যতিরেকভাবে; **চ**—এবং; **অর্থেষু**—অর্থসমূহ; **অভিজ্ঞঃ**—সম্পূর্ণরূপে অবগত; **স্বরাট্**—সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; **তেনে**—প্রকাশ করেছিলেন; **ব্রহ্ম**—বৈদিক জ্ঞান; **হৃদা**—হৃদয়ের বুদ্ধিবৃত্তি; **য**—যিনি; **আদিকবয়ে**—ব্রহ্মাকে; **মুহ্যন্তি**—মোহাচ্ছন্ন; **যৎ**—যার সম্বন্ধে; **সূরয়ঃ**—মহান্ ঋষিরা এবং দেবতারা; **তেজঃ**—অগ্নি; **বারি**—জল; **মৃদাং**—মাটি; **যথা**—যেভাবে; **বিনিময়ঃ**—পরস্পর মিশ্রণ; **যত্র**—যার ফলে; **ত্রিসর্গঃ**—প্রকৃতির তিনটি গুণ; **অমৃষা**—সত্যবৎ; **ধাম্না**—সমস্ত অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য সহ; **স্বেন**—স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে; **সদা**—সব সময়; **নিরস্ত**—নিবৃত্ত; **কুহকম্**—কুহক; **সত্যম্**—সত্য; **পরম্**—পরম; **ধীমহি**—আমি ধ্যান করি।

অনুবাদ

হে বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, কেননা তিনি হচ্ছেন প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ। তিনি প্রত্যক্ষ এবং

পরোক্ষভাবে সব কিছু সম্বন্ধে অবগত, এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, কেননা তাঁর অতীত আর কোনও কারণ নেই। তিনিই আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাঁর দ্বারা মহান্ ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারাও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ঠিক যেভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আগুনে জল দর্শন হয়, অথবা জলে মাটি দর্শন হয়। তাঁরই প্রভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মাধ্যমে জড় জগৎ সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয়, এবং তা অলীক হলেও সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, যিনি জড় জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত তাঁর ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন। আমি তাঁর ধ্যান করি, কেননা তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য।

তাৎপর্য

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই বন্দনার মাধ্যমে বসুদেব এবং দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণতি নিবেদন করা হচ্ছে। এই তত্ত্ব এই গ্রন্থে আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। এখানে শ্রীল ব্যাসদেব ঘোষণা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ—পরমেশ্বর ভগবান, এবং অন্য সব কিছুই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাঁরই প্রকাশ। এই বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *কৃষ্ণসন্দর্ভ* নামক গ্রন্থে আরও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা তাঁর রচিত *ব্রহ্ম-সংহিতায়* শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। *সামবেদেও* বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন দেবকীর দিব্য পুত্র। তাই এই প্রার্থনায়, প্রথমেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে যদি কোন অপ্রাকৃত নামের দ্বারা সম্বোধন করতে হয়, তা হলে তা হচ্ছে কৃষ্ণ, অর্থাৎ সর্বাকর্ষক। *ভগবদ্গীতায়* বহু স্থানে তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে ঘোষণা করেছেন, এবং তা অর্জুন সত্য বলে সমর্থন করেছেন, এবং নারদ, ব্যাস প্রমুখ সমস্ত মহর্ষিরাও তা নিঃশঙ্কচিত্তে স্বীকার করেছেন। *পদ্মপুরাণেও* বলা হয়েছে যে, ভগবানের অনন্ত নামের মধ্যে কৃষ্ণ নামটিই হচ্ছে মুখ্য। বাসুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অংশপ্রকাশ, এবং বাসুদেব-সদৃশ ভগবানের অন্য সমস্ত রূপেরও উল্লেখ এই শ্লোকে করা হয়েছে। বাসুদেব নামটি বিশেষভাবে বসুদেব এবং দেবকীর দিব্য-সন্তানকেই বোঝায়। পরমহংসেরা, যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রমের পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন।

বাসুদেব, অথবা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। সব কিছু তাঁর থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। কিভাবে যে সব কিছু তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়, তা এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতকে* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *অমল পুরাণ* বলে বর্ণনা করেছেন, কেননা এতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ইতিহাসও অত্যন্ত

মহিমান্বিত। মহামুনি বেদব্যাস যখন পরিপক্করূপে দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তখন তিনি এই গ্রন্থটি সংকলন করেন। তিনি তাঁর গুরুদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। ব্যাসদেব *চতুর্বেদ, বেদান্ত-সূত্র* (অথবা *ব্রহ্মসূত্র*), *পুরাণ, মহাভারত* ইত্যাদি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র সংকলন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁর গুরুদেব দেবর্ষি নারদ তাঁর সেই অসন্তুষ্টি দর্শন করে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বর্ণনা করতে। পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বিশেষভাবে এই গ্রন্থের দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেই মূল বস্তুটিতে প্রবেশ করতে হলে ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নততর জ্ঞান লাভ করে অগ্রসর হতে হয়।

চিন্তাশীল মানুষের পক্ষে সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে জানতে চাওয়াটা স্বাভাবিক। রাত্রিবেলায় অগণিত তারকাখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে সেখানে কি জীব রয়েছে? এই ধরনের প্রশ্নগুলি মানুষের পক্ষে করা স্বাভাবিক, কেননা, মানুষের চেতনা পশুদের চেতনা থেকে অনেক উন্নত। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর সরাসরিভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* রচয়িতা দান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস। তিনি কেবল এই ব্রহ্মাণ্ডেরই স্রষ্টা নন, তিনি তার ধ্বংসকর্তাও। পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে এক বিশেষ সময়ে এই জড়া প্রকৃতির প্রকাশ হয়। কিছুকালের জন্য তার স্থিতি হয়, এবং তারপর তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে তার বিনাশ হয়। তাই, এই জগতের সমস্ত কার্যকলাপের পেছনে রয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা। নাস্তিকেরা অবশ্য বিশ্বাস করে না যে, একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, কিন্তু সেটি তাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। যেমন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করেছে, এবং এই উপগ্রহগুলি বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মহাশূন্যে কিছুকালের জন্য ভাসছে। তেমনই, অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডগুলি পরমেশ্বর ভগবানের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত পুরুষদের মধ্যে সর্বোত্তম। প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই হচ্ছে এক-একটি চেতন সত্তা। অন্য সমস্ত জীবের মতো তারও ব্যক্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান, অথবা পরম চৈতন্য হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, এবং তিনি অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন। একটি মানুষের মস্তিষ্ক যদি একটি কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করতে পারে, তা হলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মানুষের থেকে উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যিনি, তিনি তার থেকে অনেক আশ্চর্যজনক এবং অনেক উন্নত বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন। সুস্থ মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ সহজেই এই যুক্তিটি মেনে নেবেন, কিন্তু অনেক একগুঁয়ে নাস্তিক রয়েছে, যারা তা স্বীকার করতে চায় না। শ্রীল ব্যাসদেব কিন্তু সেই পরম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পুরুষকে পরমেশ্বররূপে স্বীকার করেছেন। তিনি সেই পরম বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন পুরুষকে পরমেশ্বর বলে সম্বোধন করে তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি

নিবেদন করেছেন। সেই পরমেশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যা ব্যাসদেব প্রণীত *ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থে, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, তাঁর থেকে মহৎ বা পরমতত্ত্ব আর কিছু নেই। তাই শ্রীল ব্যাসদেব সেই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ আরাধনা করেছেন, যাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

বিকৃত মনোভাবাপন্ন অসৎ মানুষেরা সরাসরিভাবে দশম স্কন্ধে প্রবেশ করতে চায়, বিশেষ করে দশম স্কন্ধের সেই পাঁচটি অধ্যায়ে যেখানে পরমেশ্বর ভগবানের রাসলীলার বর্ণনা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অংশটি হচ্ছে সব চাইতে গোপনীয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হচ্ছেন, ততক্ষণ পরমেশ্বর ভগবানের রাসলীলা নামক পরম শ্রদ্ধেয় লীলাবিলাসের তত্ত্ব এবং ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তাঁর প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কখনই সম্ভব নয়। এটি হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের সর্বোচ্চ বিষয় এবং যে সমস্ত মুক্ত পুরুষ ধীরে ধীরে পরমহংস স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল এই রাসলীলার অপ্রাকৃত মাধুর্য আস্বাদন করতে পারেন। শ্রীল ব্যাসদেব তাই পাঠককে ধীরে ধীরে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে অবশেষে ভগবানের এই লীলাবিলাসের মাধুর্য আস্বাদন করার সুযোগ দান করেছেন। তাই তিনি 'ধীমহি' কথাটির মাধ্যমে গায়ত্রী মন্ত্রের আবাহন করেছেন। এই গায়ত্রী মন্ত্র পারমার্থিক প্রগতিসম্পন্ন মানুষদের জন্য। কেউ যখন যথাযথভাবে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হন। তাই গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করতে হলে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করতে হয় অথবা যথার্থভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে হয়, এবং তখনই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির অপ্রাকৃত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত শক্তিসম্ভূত তাঁর স্বরূপের বর্ণনা এবং তাঁর এই অন্তরঙ্গা শক্তি, আমাদের গোচরীভূত এই জড় জগতকে প্রকাশিত করেছেন যে বহিরঙ্গা শক্তি, তা থেকে ভিন্ন। শ্রীল ব্যাসদেব এই শ্লোকে এই দুইয়ের পার্থক্য স্পষ্টভাবে নিরূপণ করেছেন। শ্রীল ব্যাসদেব এখানে বলেছেন যে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ নিত্য, কিন্তু জড় জগতের প্রকাশকারী তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি মরুভূমির বুকে মরীচিকার মতো ক্ষণস্থায়ী এবং অলীক। মরুভূমির বুকে যে মরীচিকা দেখা যায়, তাতে প্রকৃতপক্ষে জল নেই। সেখানে কেবল জলের আভাস রয়েছে। প্রকৃত জল অন্য কোথাও রয়েছে। এই জড় সৃষ্টিকে বাস্তব বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে অপ্রাকৃত জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র। পরম সত্য রয়েছে অপ্রাকৃত জগতে, এই জড় জগতে তার প্রকাশ নেই। এই জড় জগতে সব কিছুই হচ্ছে আপেক্ষিক সত্য। অর্থাৎ এখানে সত্য অন্য কোন কিছুর ওপর নির্ভর করে রয়েছে। এই জড় সৃষ্টির প্রকাশ হয় প্রকৃতির তিনটি গুণের সমন্বয়ের ফলে, এবং এই ক্ষণস্থায়ী

সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবের মোহাচ্ছন্ন চিত্তে বাস্তবের কুহক সৃষ্টি করা, এবং তার ফলে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতারাও পর্যন্ত মুহ্যমান হয়ে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে, এই জড় জগতে বাস্তব বলে কিছু নেই। এই জড় জগতকে বাস্তব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তব বস্তু হচ্ছে চিন্ময় জগৎ, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পার্ষদ সহ নিত্য বিরাজ করেন।

কোন জটিল কলকব্জার নির্মাতা যে মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার, তিনি কখনও সরাসরিভাবে সেটি তৈরির ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেন না, তবুও তিনি তার প্রতিটি অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন, কেননা সব কিছু তারই পরিচালনায় সম্পাদিত হয়েছে। তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সেটি তৈরির ব্যাপারে সব কিছু জানেন। তেমনই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের পরম সৃষ্টিকর্তা, সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবগত, যদিও এখানকার কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় স্বর্গের দেব-দেবীদের মাধ্যমে। এই জড় জগতে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি পিপীলিকা পর্যন্ত কেউই স্বাধীন নয়। ভগবানের প্রভাব সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। সমস্ত জড় বস্তু এবং চিৎ-স্ফুলিঙ্গ তাঁর থেকেই প্রকাশিত হয়। জড় এবং চেতন, এই দুটি শক্তির সমন্বয়ের ফলেই এই জড় জগতে সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে, এবং দুটি শক্তিই, পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কোন রসায়নবিদ রসায়নাগারে হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের মিলন ঘটিয়ে জল তৈরি করতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রসায়নবিদ রসায়নাগারে যে কর্ম করছে, তা পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় সম্পাদিত হচ্ছে এবং যে সমস্ত উপাদান নিয়ে তারা কাজ করছে, সে সবই সরবরাহ করছেন পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সব কিছু সম্বন্ধেই অবগত, এবং অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধেও তিনি অভিজ্ঞ এবং তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। ভগবানকে একটি স্বর্ণখনির সঙ্গে তুলনা করা যায়, আর এই জড় জগতের সৃষ্ট সব কিছুকে আংটি, হার ইত্যাদি স্বর্ণনির্মিত বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। আংটি, হার ইত্যাদি বস্তুগুলিও গুণগতভাবে স্বর্ণখনির সমস্ত স্বর্ণের সঙ্গে এক, কিন্তু আয়তনগতভাবে স্বর্ণখনিগুলি স্বর্ণ থেকে ভিন্ন। তেমনই পরমতত্ত্বও যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন। কোন কিছুই পরম সত্যের সমপর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু তবুও কোন কিছুই পরমতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র নয়।

এই জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত বদ্ধ জীবেরাই কিছু না কিছু সৃষ্টি করছে, কিন্তু তারা কেউই পরমেশ্বর ভগবানের থেকে স্বতন্ত্র নয়। জড়বাদীরা ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, তারাই হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। একে বলা হয় মায়া অথবা মোহাচ্ছন্ন অবস্থা। জ্ঞানের অভাবের ফলেই জড়বাদীরা তাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে আর কিছু দেখতে পায় না, এবং তাই তারা মনে করে যে, উন্নত বুদ্ধিমত্তা ব্যতীত আপনা থেকেই জড় জগতের প্রকাশ হয়েছে। এই শ্লোকে শ্রীল ব্যাসদেব তাদের সেই নির্বোধ মতবাদকে খণ্ডন

করেছেন ঃ "যেহেতু সেই পূর্ণ বস্তু অথবা পরম সত্য হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, তাই কোন কিছুই সেই পরম সত্য থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না।" দেহে যা কিছু ঘটে দেহী তৎক্ষণাৎ তা বুঝতে পারে। তেমনই এই সৃষ্টি হচ্ছে সেই পূর্ণ বস্তুর দেহ। তাই এই সৃষ্টিতে যা কিছু হচ্ছে সে সম্বন্ধে পূর্ণ পুরুষোত্তম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অবগত।

শ্রুতি মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্ণ বস্তু অথবা ব্রহ্ম হচ্ছে সব কিছুরই পরম উৎস। সব কিছু তাঁর থেকেই প্রকাশিত হয়, এবং সব কিছুই তাঁর দ্বারা প্রতিপালিত হয়, এবং অবশেষে সব কিছুই তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। স্মৃতি মন্ত্রেও এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের শুরু থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে এবং যাঁর মধ্যে অবশেষে সব কিছু প্রবিষ্ট হবে, সে সবেরই উৎস হচ্ছেন পরম সত্য বা ব্রহ্ম। জড় বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন যে, সূর্য হচ্ছে গ্রহমণ্ডলীর উৎস, কিন্তু সূর্যের উৎস যে কি তা বিশ্লেষণ করতে তাঁরা অক্ষম। এখানে সব কিছুর পরম উৎস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে, ব্রহ্মা, যাঁকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, তিনি পরম স্রষ্টা নন। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে,পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করেছিলেন। এই সম্বন্ধে কেউ তর্ক করতে পারে যে, যেহেতু ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম সৃষ্ট জীব, তাই অন্য কেউই তাঁকে জ্ঞান দান করতে পারে না, কেন না সে সময় আর অন্য কোনও জীব ছিল না। কিন্তু এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে গৌণ স্রষ্টা ব্রহ্মাকে পরমেশ্বর ভগবান জ্ঞান দান করেছিলেন যাতে ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করতে পারেন। তাই সমস্ত সৃষ্টির পিছনে রয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম বুদ্ধিমত্তা। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে তিনিই সৃষ্টিশক্তি, প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন, যা হচ্ছে পূর্ণ জড় সৃষ্টির মূল আধার। তাই শ্রীল ব্যাসদেব ব্রহ্মার বন্দনা না করে পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করেছেন, যিনি সৃষ্টিকার্যে ব্রহ্মাকে পরিচালিত করেন। এই শ্লোকে 'অভিজ্ঞ' এবং 'স্বরাট' শব্দ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শব্দ দুটি অন্য সমস্ত জীব থেকে পরমেশ্বর ভগবানের পার্থক্য নিরূপণ করে। অন্য কোনও জীবই 'অভিজ্ঞ' অথবা 'স্বরাট' নয়। অর্থাৎ কেউই সম্পূর্ণরূপে সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞাত নয় অথবা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নয়। ব্রহ্মাকেও সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করতে হয়েছিল। তা হলে আইনস্টাইনের মত বৈজ্ঞানিকদের কি কথা! এ ধরনের বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্ক অবশ্যই কোন মানুষ সৃষ্টি করেনি। কোন বৈজ্ঞানিক এই ধরনের মস্তিষ্ক তৈরি করতে পারে না, সুতরাং যে সমস্ত গণ্ডমূর্খ নাস্তিক ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাদের কি কথা? যে সমস্ত মায়াবাদী (নির্বিশেষবাদী) পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে, তারাও অভিজ্ঞ অথবা স্বরাট নয়। এই ধরনের নির্বিশেষবাদীরাও ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করবার জন্য বহু তপস্যা করে, কিন্তু অবশেষে তারা তাদের যে সমস্ত ধনী শিষ্য তাদের টাকা সরবরাহ করে এবং মন্দির বানিয়ে দেয় তাদের হুকুমের গোলামে

পরিণত হয়। রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রমুখ নাস্তিকদের ভগবানের কর্তৃত্ব অস্বীকার করার জন্য কঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে ভগবান যখন নিষ্ঠুর মৃত্যুরূপে তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন, তখন তারা সম্পূর্ণভাবে অসহায় হয়ে পড়েছিল। আধুনিক যুগের যে সমস্ত নাস্তিকেরা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাদেরও সেই একই অবস্থা হবে। এই ধরনের নাস্তিকদেরও ঠিক তেমনভাবেই দণ্ডভোগ করতে হবে, কেন না ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি করে। মানুষ যখনই পরমেশ্বর ভগবানের ভগবত্তা অস্বীকার করে তখন প্রকৃতি এবং প্রকৃতির নিয়ম তাদের দণ্ডদান করে। সে কথা *ভগবদ্গীতায়* অতি প্রসিদ্ধ শ্লোক *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ* শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ "যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের বিস্তার হয়, হে অর্জুন, তখন আমি অবতরণ করি।" (ভগবদ্গীতা ৪/৭)

পরমেশ্বর ভগবান যে সম্যক্‌ভাবে পূর্ণ সেকথা সমস্ত শ্রুতি মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রুতি মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে সর্বতোভাবে পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন এবং তার ফলে জড় জগতের প্রাণের সঞ্চার হয়ে সৃষ্টি শুরু হয়। জীব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তিনি তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে চেতনের স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ জীবদের প্রকৃতির গর্ভে সঞ্চারিত করেন, এবং তার ফলে তাঁর সৃষ্টিশক্তি কার্যকরী হয়ে অপূর্ব সুন্দর সমস্ত সৃষ্টি প্রকাশ করে। একজন নাস্তিক তর্ক করতে পারে যে ভগবান একজন ঘড়ি-নির্মাতার চেয়ে অভিজ্ঞ নন, কিন্তু ভগবান তাঁর সৃষ্টি থেকে অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ, কেন না তিনি স্ত্রী এবং পুরুষ রূপী দুটি যন্ত্র সৃষ্টি করেছেন এবং এই যন্ত্র দুটির মাধ্যমে সেরকম অসংখ্য যন্ত্র সৃষ্টি করতে পারেন। কোন মানুষ যদি এমন কোন যন্ত্র সৃষ্টি করতে পারে যা তার সাহায্য বা অভিনিবেশ ছাড়াই সেরকম যন্ত্র তৈরি করতে পারে, তা হলে সে ভগবানের বুদ্ধিমত্তার ধারে কাছে যেতে পারে। কিন্তু সেটি সম্ভব নয়, কেন না মানুষের তৈরি কোন যন্ত্রই স্বতন্ত্রভাবে কার্যকরী হতে পারে না। তাই কেউই ভগবানের মত সৃষ্টি করতে পারে না। ভগবানের আর একটি নাম হচ্ছে অসমোর্ধ্ব, অর্থাৎ তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে মহৎ আর কেউ নেই। পরম সত্য হচ্ছেন তিনিই, যাঁর সমকক্ষ অথবা যাঁর থেকে মহৎ কেউই হতে পারে না। সে কথা শ্রুতি মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে কেবল ভগবানই ছিলেন, যিনি হচ্ছেন সকলেরই প্রভু। ভগবান ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করেছিলেন। সেই ভগবানের সমস্ত নির্দেশ সর্বতোভাবে পালন করা উচিত। কেউ যদি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় তা হলে তাকে অবশ্যই ভগবানের শরণাগত হতে হবে। সে কথা ভগবদ্গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করছে, ততক্ষণ তাকে মোহাচ্ছন্ন থাকতেই হবে। কোন বুদ্ধিমান মানুষ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেন এবং সম্পূর্ণভাবে অবগত হন যে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, যে কথা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে,

তখন সেই অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মানুষ মহাত্মায় পর্যবসিত হন। তবে এই ধরনের মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। মহাত্মারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত সৃষ্টির পরম কারণ রূপে জানতে পারেন। তিনিই পরম অথবা চরম সত্য, কেন না আর সমস্ত সত্যই তাঁর উপরে নির্ভর করে বিরাজ করে। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি কখনই মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হন না।

কোন কোন মায়াবাদী পণ্ডিত তর্ক করে যে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেননি, এবং তাদের কেউ কেউ বলে যে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বোপদেব নামক জনৈক ব্যক্তির রচিত একটি আধুনিক গ্রন্থ। এই ধরনের মতামতগুলি সম্পূর্ণরূপে যুক্তিহীন। শ্রীধর স্বামী দেখিয়ে গেছেন যে বহু প্রাচীন পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ রয়েছে। সবচাইতে প্রাচীন পুরাণ মৎস্য পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ রয়েছে। এই পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীমদ্ভাগবতের শুরু হয়েছে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে এবং তাতে বহু পারমার্থিক নির্দেশের বর্ণনা রয়েছে। তাতে বৃত্রাসুরের ইতিহাস রয়েছে। পূর্ণিমার দিনে এই গ্রন্থটি কাউকে দান করলে জীবনের পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। অন্যান্য পুরাণেও শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এই গ্রন্থটি ১২টি স্কন্ধে সমাপ্ত হয়েছে, এবং তাতে ১৮,০০০ শ্লোক রয়েছে। পদ্ম পুরাণেও গৌতম মুনি এবং মহারাজ অম্বরীষের আলোচনায় শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে গৌতম মুনি মহারাজ অম্বরীষকে উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি যদি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান তা হলে তিনি যেন নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের পরেও, গত ৫০০ বছর ধরে শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য প্রমুখ বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করেছেন। যাঁরা ঐকান্তিকভাবে জ্ঞানের অন্বেষী তাঁরা যেন আরও গভীরভাবে দিব্য জ্ঞান আস্বাদন করার জন্য সেই সমস্ত ভাষ্য পাঠ করার চেষ্টা করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর জড় কামোন্মত্ততা-রহিত আদি রসের আলোচনা করেছেন। সমস্ত জড় সৃষ্টিই কামভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। আধুনিক যুগে কামই হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের মূল অনুপ্রেরণা। যেদিকেই তাকানো যায় দেখা যায় যৌন আবেদনের হাতছানি। সুতরাং এই যৌন আবেদন অবাস্তব নয়। তবে তার যথার্থ প্রকাশ হচ্ছে চিৎ জগতে—ভগবদ্ধামে। এই জড় জগতের যৌন জীবন হচ্ছে প্রকৃত প্রেমের বিকৃত প্রতিফলন। বাস্তব বস্তু হচ্ছে পরম সত্য, এবং তাই পরম সত্য কখনই নির্বিশেষ হতে পারে না। নির্বিশেষ বা নিরাকার কোন কিছুর পক্ষে বিশুদ্ধ প্রেম আস্বাদন করা সম্ভব হতে পারে না। মায়াবাদী দার্শনিকেরা যেহেতু পরম সত্যে নির্বিশেষত্ব আরোপ করেছে তাই তারা অতি ঘৃণ্য যৌন জীবনের প্রতি

পরোক্ষভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে। যে মানুষের অপ্রাকৃত ভগবৎ-প্রেম সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, তারা ভগবৎ-প্রেমের বিকৃত প্রতিফলন কাম বা যৌন আবেদনকেই জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করে। এই জড় জগতের বিকৃত যৌন জীবনের সঙ্গে অপ্রাকৃত জগতের বিশুদ্ধ প্রেমের আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে।

এই *শ্রীমদ্ভাগবত* ধীরে ধীরে নিরপেক্ষ পাঠককে পারমার্থিক জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে। এই গ্রন্থ মানুষকে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত কার্যকলাপ—সকাম কর্ম, জল্পনা-কল্পনা-প্রসূত জ্ঞান এবং আনুষ্ঠানিক উপাসনার স্তর অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

শ্লোক ২

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ২ ॥

ধর্ম—ধর্ম; **প্রোজ্ঝিত**—সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে; **কৈতবঃ**—ভুক্তিমুক্তি বাসনা যুক্ত; **অত্র**—এখানে; **পরমঃ**—সর্বোচ্চ; **নির্মৎসরাণাম্**—যাঁর হৃদয় সম্পূর্ণভাবে নির্মল হয়েছে; **সতাম্**—ভক্ত; **বেদ্যম্**—বোধগম্য; **বাস্তবম্**—বাস্তব; **অত্র**—এখানে; **বস্তু**—বস্তু; **শিবদম্**—পরমানন্দদায়ক; **তাপ-ত্রয়**—ত্রিতাপ; **উন্মূলনম্**—সমূলে উৎপাটিত করে; **শ্রীমৎ**—সুন্দর; **ভাগবতে**—ভাগবত পুরাণ; **মহামুনি**—মহামুনি (ব্যাসদেব); **কৃতে**—রচিত; **কিম্**—কি; **বা**—প্রয়োজন; **পরৈঃ**—অন্য কিছু; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সদ্যঃ**—অবিলম্বে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **অবরুধ্যতে**—অবরুদ্ধ হয়; **অত্র**—এখানে; **কৃতিভিঃ**—সুকৃতি সম্পন্ন মানুষদের দ্বারা; **শুশ্রূষুভিঃ**—অনুশীলনের ফলে; **তৎ-ক্ষণাৎ**—অবিলম্বে।

অনুবাদ

জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছে পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু; সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস (উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায়) এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটিই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

ধর্মের অন্তর্গত চারটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে—পুণ্যকর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং চরমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি। ধর্মবিহীন জীবন হচ্ছে অসভ্য জীবন। ধর্ম আচরণ শুরু হলেই কেবল যথার্থ মানব জীবনের শুরু হয়। আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এই চারটি হচ্ছে পশু জীবনের ভিত্তি। এই প্রবৃত্তিগুলি মানুষ এবং পশু উভয়ের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু ধর্ম আচরণ হচ্ছে মানব জীবনের একটি বিশেষ কার্য। ধর্মবিহীন মনুষ্য জীবন পশুজীবনের থেকে কোন অংশেই উন্নত নয়। তাই মানব সমাজে ধর্ম-অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হওয়া।

মানব সভ্যতার নিম্ন স্তরে সব সময়ই জড় জগতকে ভোগ করার তীব্র বাসনা থাকে এবং তার ফলে নিরন্তর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এই ধরনের চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ ক্রমান্বয়ে বিপর্যস্ত হতে হতে অবশেষে ধর্মের প্রতি উন্মুখ হয়। সে তখন জড় সুখভোগের আশায় পুণ্যকর্ম অথবা ধর্ম-অনুষ্ঠান করে। কিন্তু এই ধরনের জড় সুখভোগ যদি অন্য উপায়ে লাভ করা যায়, তখন তারা তথাকথিত সেই সমস্ত ধর্ম আচরণে অবহেলা করে। এটিই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার পরিস্থিতি। মানুষ যথেষ্ট অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছে, তাই এখন আর তারা ধর্মের প্রতি ততটা উৎসাহী নয়। মন্দির, মসজিদ অথবা গির্জাগুলি এখন প্রায় শূন্যই পড়ে থাকে। মানুষ এখন তাদের পূর্ব পুরুষদের তৈরি ধর্ম-আচরণের স্থানগুলি থেকে কল-কারখানা, দোকান-বাজার এবং প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদির প্রতি অধিক উৎসাহী। এর থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্যই সেই ধরনের ধর্ম অনুষ্ঠান হয়। অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজন ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য। অনেক সময় দেখা যায় যে কেউ যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়, তখন সে মোক্ষলাভের চেষ্টা করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের প্রচেষ্টাগুলিও ইন্দ্রিয় সুখভোগেরই নামান্তর।

বেদে এই চারটি কর্মেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ যথাযথভাবে তাদের জীবনপথে অগ্রসর হতে পারে এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য পরস্পরের মধ্যে অনর্থক প্রতিযোগিতা না হয়। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে সমস্ত কার্যকলাপের অতীত এক দিব্য শাস্ত্র। এটি হচ্ছে পূর্ণরূপে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত একটি গ্রন্থ, যা কেবল জড় ভোগ-বাসনা রহিত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। জড় জগতের মানুষে মানুষে, পশুতে-পশুতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, জাতিতে-জাতিতে নিরন্তর প্রতিযোগিতা হচ্ছে। কিন্তু ভগবানের ভক্তরা এই ধরনের প্রতিযোগিতার অতীত। তাঁরা জড়বাদীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন না, কেন না তাঁরা ভগবদ্ধামের দিকে এগিয়ে চলেছেন, যেখানে জীবন নিত্য

এবং আনন্দময়। এই ধরনের মহাত্মারা সম্পূর্ণরূপে নির্মৎসর এবং তাঁদের হৃদয়বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নির্মল। জড় জগতের সকলকেই একে অপরকে হিংসা করে, এবং তাই পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়। কিন্তু ভগবানের ভক্তরা কেবল জড়জাগতিক ঈর্ষা থেকেই মুক্ত নন, তাঁরা সকলেরই শুভাকাঙ্ক্ষী,-এবং তাঁরা চেষ্টা করেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন ভগবৎ-কেন্দ্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার। আধুনিক যুগের সাম্যবাদও প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা যথাযথ নয়, কেন না সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও রাষ্ট্রপ্রধানের পদের জন্য প্রতিযোগিতা রয়েছে। বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে অথবা সাধারণ মানবিক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে ইন্দ্রিয় সুখভোগ হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভিত্তি। বেদে তিনটি পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি হচ্ছে উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার জন্য সকাম কর্ম, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে তাঁদের লোকে উন্নীত হওয়া এবং তৃতীয়টি হচ্ছে নির্বিশেষরূপে পরম সত্যকে উপলব্ধি করে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।

পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ রূপ তাঁর সর্বোচ্চ প্রকাশ নয়। নির্বিশেষ রূপের উর্ধ্বে হচ্ছে ভগবানের পরমাত্মা রূপ এবং তারও উর্ধ্বে হচ্ছে পরমতত্ত্বের সবিশেষ রূপ—তাঁর ভগবান রূপ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* পরমতত্ত্বের সবিশেষ রূপের বর্ণনা রয়েছে। এটি নির্বিশেষ তত্ত্ব-সমন্বিত গ্রন্থাবলী এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ড থেকে অনেক উচ্চস্তরের বিষয়। এমন কি এটি কর্মকাণ্ড এবং উপাসনাকাণ্ডেরও উর্ধ্বে, কেন না এতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। কর্মকাণ্ডে উন্নততর ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার কামনা রয়েছে, এবং জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনাকাণ্ডেও এই ধরনের কামনা রয়েছে। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবত* সেগুলি থেকে অনেক উর্ধ্বে, কারণ তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে পরম সত্যের সবিশেষ প্রকাশ পরমেশ্বর ভগবান, যিনি হচ্ছেন সব কিছুরই পরম কেন্দ্র। *শ্রীমদ্ভাগবতের* মাধ্যমে মূল তত্ত্ব এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য উভয় সম্বন্ধেই অবগত হওয়া যায়। মূল তত্ত্ব হচ্ছেন পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান, এবং অন্য সব কিছুই হচ্ছে তাঁর শক্তির আপেক্ষিক প্রকাশ।

কোন কিছুই মূল তত্ত্ব থেকে বিচ্যুত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও শক্তি শক্তিমান থেকে ভিন্ন। এই ধারণাটি পরস্পরবিরোধী নয়। বেদান্ত-সূত্রের একটি সূত্র *জন্মাদ্যস্য যতঃ* এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে যে *শ্রীমদ্ভাগবত*, তাতে বেদান্ত-সূত্রের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

যে সমস্ত মনোধর্মী শক্তিকে পরমতত্ত্ব বলে প্রচার করতে চায় তাদের সেই বিকৃত সিদ্ধান্তের উত্তর হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বিজ্ঞান, যাতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে ভগবানের শক্তি ভগবানের সঙ্গে যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন। এই জ্ঞান যখন যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তখন দেখা যায় যে দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ উভয়ই অপূর্ণ। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের ভিত্তিতে যখন দিব্য চেতনার বিকাশ

হয় তখন মানুষ জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হন। এই ত্রিতাপ দুঃখ হচ্ছে—(১) মন এবং দেহজাত আধ্যাত্মিক ক্লেশ, (২) অন্য প্রাণীজনিত আধিভৌতিক ক্লেশ, এবং (৩) প্রাকৃতিক বিপর্যয়জাত আধিদৈবিক ক্লেশ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সূচনা হচ্ছে ভগবানের চরণে শরণাগতির মাধ্যমে। ভক্ত সর্বতোভাবে অবগত থাকেন যে তিনি পরমেশ্বরের সঙ্গে এক, তবে তাঁর স্থিতি হচ্ছে পরমেশ্বরের নিত্য সেবক রূপে। জড় জগতে ভ্রান্তিবশত কেউ মনে করতে পারে যে তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর অধীশ্বর, এবং তার ফলে তিনি নিরন্তর ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করেন। কিন্তু কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে তার যথার্থ স্বরূপে তিনি হচ্ছেন ভৃত্য, তৎক্ষণাৎ তিনি সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হন। জীব যতক্ষণ জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করে, ততক্ষণ তার পক্ষে ভগবানের সেবক হওয়ার কোন রকম সম্ভাবনাই থাকে না। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা পারমার্থিক স্বরূপের শুদ্ধ চেতনার মাধ্যমেই কেবল সাধিত হয়; এই সেবার মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

সর্বোপরি, *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে বেদান্ত-সূত্রের রচয়িতা শ্রীল ব্যাসদেব কর্তৃক প্রদত্ত বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য। তাঁর পারমার্থিক জীবনের পরিপক্ক অবস্থায় নারদ মুনির কৃপায় তিনি সেটি রচনা করেন। শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের অবতার। তাই তাঁর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তিনি হচ্ছেন বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থের প্রণেতা, আর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করার আর কোন প্রয়োজন নেই, কেবল *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করলেই পরমার্থ সাধিত হবে। অন্যান্য পুরাণে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করার পন্থা নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কথাই বর্ণিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ, এবং বিভিন্ন দেব-দেবীরা হচ্ছেন তাঁর অংশ-সদৃশ। তাই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করলে আর অন্য দেব-দেবীর পূজা করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবান তৎক্ষণাৎ ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *শ্রীমদ্ভাগবতকে অমল পুরাণ* বলে অভিহিত করে অন্যান্য সমস্ত পুরাণ থেকে তার স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করেছেন।

পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করার যথার্থ পন্থা হচ্ছে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শ্রবণ। উদ্ধত ভাবসম্পন্ন হলে এই অপ্রাকৃত বাণী হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যথার্থভাবে এই জ্ঞান আহরণ করা সম্বন্ধে 'শুশ্রূষু' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করার জন্য ঐকান্তিকভাবে উৎকণ্ঠিত হতে হবে। নিষ্ঠাভরে তা শ্রবণ করাই হচ্ছে এই জ্ঞান আহরণের প্রাথমিক যোগ্যতা।

যে সমস্ত মানুষ দুর্ভাগা, তারা এই *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণে বিন্দুমাত্রও উৎসাহী নয়। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল, কিন্তু তার প্রয়োগ অত্যন্ত কঠিন। দুর্ভাগা মানুষেরা রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে অলস আলোচনা করার যথেষ্ট সময় পায়, কিন্তু

যখন তাদের ভক্তসঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার জন্য আহ্বান করা হয় তখন তারা তাতে তাদের অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কখনও কখনও পেশাদারি ভাগবত পাঠকেরা শুরুতেই পরমেশ্বর ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ এবং অতি গোপনীয় লীলাবিলাসের আলোচনা করে, যা শুনে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তা যেন একটি কাম-বিষয়ক গ্রন্থ। *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করতে হয় প্রথম থেকে। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা সম্বন্ধে এই শ্লোকে বলা হয়েছেঃ "বহু সুকৃতি অর্জন করার ফলে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার যোগ্যতা লাভ করা যায়।" বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁদের চিন্তাশীল বিচারের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারেন যে মহর্ষি বেদব্যাস আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। বেদে নির্দেশিত পারমার্থিক উপলব্ধির বিভিন্ন স্তরে উন্নীত না হয়েও, কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের এই জ্ঞান শ্রবণ করার মাধ্যমেই কেবল সরাসরিভাবে পরমহংস স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

শ্লোক ৩

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৩ ॥

নিগম—বৈদিক শাস্ত্রসমূহ; **কল্প-তরোঃ**—কল্পবৃক্ষ; **গলিতম্**—অত্যন্ত সুপক্ক; **ফলম্**—ফল; **শুক**—শ্রীমদ্ভাগবতের আদি বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; **মুখাৎ**—মুখ থেকে; **অমৃত**—অমৃত; **দ্রব**—ঈষৎ কঠিন এবং কোমল হওয়ার ফলে যা সহজে গেলা যায়; **সংযুতম্**—সর্বতোভাবে পূর্ণ; **পিবত**—আস্বাদন করেন; **ভাগবতম্**—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ; **রসম্**—রস (যা আস্বাদন করা যায়); **আলয়ম্**—মুক্তি পর্যন্ত, অথবা মুক্ত অবস্থাতে; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **অহো**—হে; **রসিকাঃ**—যারা সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-প্রীতিরস সম্পর্কে অবগত; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে; **ভাবুকাঃ**—বিচক্ষণ এবং চিন্তাশীল।

অনুবাদ

হে বিচক্ষণ এবং চিন্তাশীল মানুষ, কল্পবৃক্ষরূপী বৈদিক শাস্ত্রের অত্যন্ত সুপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন করুন। তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। তাই এই ফলটি আরও অধিক উপাদেয় হয়েছে, যদিও এই অমৃতময় রস মুক্ত পুরুষেরা পর্যন্ত আস্বাদন করে থাকেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী দুটি শ্লোকে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* তার অপ্রাকৃত গুণাবলীর প্রভাবে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মধ্যে সর্বোত্তম। এই গ্রন্থে যে জ্ঞান বিতরণ করা হয়েছে তা সব রকমের জাগতিক কার্যকলাপ এবং পার্থিব জ্ঞানের অতীত। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে *শ্রীমদ্ভাগবত* কেবল উন্নত জ্ঞান-সমন্বিত শাস্ত্রই নয়, তা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সুপক্ক ফল। পক্ষান্তরে বলা যায় এটি হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার। এই সমস্ত তথ্য বিবেচনা করে ধৈর্য এবং বিনয় সহকারে তা শ্রবণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতা সহকারে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী শ্রবণ করা উচিত।

বেদকে কল্পবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেন না তাতে মানুষের জ্ঞাতব্য সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। বেদে পরমার্থ-বিষয়ক জ্ঞান যেমন প্রচার করা হয়েছে, তেমনই জাগতিক প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে তাতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বেদে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামরিক, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, অধিবিদ্যা ইত্যাদি সব রকম জাগতিক বিষয়-সম্বন্ধীয় বৈধজ্ঞান প্রদত্ত হয়েছে এবং এইগুলি শরীর ও মন নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজন হতে পারে। এই সমস্ত বিষয়ের ঊর্ধ্বে অধ্যাত্ম বিষয়ের নির্দেশ রয়েছে। বিধিবদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে জীবকে ক্রমান্বয়ে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত করা হয় এবং সর্বোচ্চ পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে সমস্ত দিব্য আনন্দ বা রসের আধার পরমেশ্বর ভগবানকে জানা।

এই জড় জগতের প্রথম জীব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই ইন্দ্রিয়ানুভূতি-প্রসূত অন্য কোন রকম সুখ আস্বাদন করতে চায়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখগুলিকে বলা হয় রস। বিভিন্ন রকমের রস রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে নিম্নলিখিত বারোটি রসের উল্লেখ করা হয়েছেঃ ১) রৌদ্র, ২) অদ্ভুত, ৩) হাস্য, ৪) বীর, ৫) করুণ, ৬) বীভৎস, ৭) ভয়ানক, ৮) শান্ত, ৯) দাস্য, ১০) সখ্য, ১১) বাৎসল্য, এবং ১২) মাধুর্য।

এই সমস্ত রসের সমন্বয়কে বলা হয় প্রেম। প্রেমের মুখ্য লক্ষণগুলি হচ্ছে সম্ভ্রম, সেবা, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য। এই পাঁচটি রস যখন অনুপস্থিত থাকে, তখন প্রেম পরোক্ষভাবে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, রৌদ্র, করুণ, ভয়ানক এবং বীভৎস রসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যেমন,কোন পুরুষ যখন কোন স্ত্রীর প্রতি আসক্ত থাকে, তখন সেই রসকে বলা হয় মাধুর্য রস। কিন্তু পরস্পরের প্রতি তাদের এই আসক্তি যখন ব্যাহত হয় তখন বিস্ময়, ক্রোধ, বীভৎস অথবা ভয়ানক ভাবের উদয় হতে পারে। অনেক সময় স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডে পর্যবসিত হতে দেখা যায়। এই সমস্ত রসগুলি মানুষের সঙ্গে মানুষের অথবা পশুর সঙ্গে পশুর মধ্যে দেখা যায়। মানুষের সঙ্গে অন্য কোন জীবের এই ধরনের বিনিময়ের সম্ভাবনা নেই। রসের বিনিময়

স্বজাতির মধ্যেই হয়ে থাকে। গুণগতভাবে জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের স্বজাতীয়। তাই চিন্ময় স্তরে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের রস-বিনিময় পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়।

তাই শ্রুতি মন্ত্রে ভগবানকে *রসো বৈ সঃ* অর্থাৎ সমস্ত রসের উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে কারও স্বরূপগত রসের বিনিময় হয় তখনই কেবল যথার্থভাবে আনন্দ আস্বাদন হয়। তখনই কেবল যথার্থভাবে সুখী হওয়া যায়।

শ্রুতি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে কোন বিশেষ রসে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মুক্ত অবস্থাতেই কেবল জীবের স্বরূপগত রস পূর্ণরূপে অনুভূত হয়। জড় জগতে যে রস আস্বাদিত হয়ে থাকে তা প্রকৃত রসের বিকৃত প্রতিফলন এবং অনিত্য। জড় জগতে রসের যে প্রকাশ দেখা যায় তা হচ্ছে চিন্ময় রসগুলির জড়জাগতিক রূপ—তা প্রকৃত রস নয়।

তাই যিনি এই সমস্ত রসগুলির সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত হয়েছেন, যা হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের মৌলিক অনুপ্রেরণা, তিনি বুঝতে পারেন কিভাবে প্রকৃত রসগুলি জড় জগতে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। যাঁরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী তাঁরা তাঁদের চিন্ময় স্বরূপে যথার্থ রস আস্বাদন করার প্রয়াস করেন। প্রাথমিক স্তরে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা করেন। তাই অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন অধ্যাত্মবাদীরা যেহেতু বিভিন্ন রস সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাই তাঁরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তির ঊর্ধ্বে অগ্রসর হতে পারেন না।

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে *শ্রীমদ্ভাগবত* যেহেতু বৈদিক জ্ঞানের সুপক্ক ফল, তাই তা মুক্ত অবস্থাতেই আস্বাদন করা যায়। শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে এই অপ্রাকৃত শাস্ত্র শ্রবণ করার ফলে হৃদয় ভরে এই পূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করা যায়। তবে যথার্থ বক্তার কাছ থেকে এই বাণী শ্রবণ করতে হবে—যার-তার কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করলে চলবে না। যথার্থ গুরুপরম্পরার ধারায় এই জ্ঞান আহরণ করতে হয়। চিন্ময় জগৎ থেকে এই জ্ঞান নিয়ে আসেন নারদ মুনি এবং তিনি তাঁর শিষ্য ব্যাসদেবকে তা দান করেন। ব্যাসদেব তা তাঁর পুত্র শুকদেব গোস্বামীকে দান করেন, এবং শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যুর সাতদিন পূর্বে তাঁকে এই জ্ঞান দান করেছিলেন। শুকদেব গোস্বামী তাঁর জন্মের পূর্বে থেকেই মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি যখন তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন তখনই তিনি মুক্ত ছিলেন, এবং তাঁর জন্মের পর তাঁকে কোন রকম পারমার্থিক শিক্ষালাভের সংস্কার করতে হয় নি। জন্মের সময়, তা সে জড়জাগতিক বিচার শক্তি হোক্ অথবা পারমার্থিক বিচার শক্তি হোক্, জীবের যথার্থ যোগ্যতা থাকে না। কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যেহেতু সম্পূর্ণরূপে মুক্ত পুরুষ ছিলেন, তাই তাঁকে ক্রমান্বয়ে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয় নি। কিন্তু তিনি জড় জগতের তিনটি গুণের অতীত এবং মুক্ত অবস্থায় অধিষ্ঠিত হলেও, তিনি মুক্ত পুরুষদের দ্বারা বৈদিক শ্লোকে বন্দিত পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত রসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাস বদ্ধ জীবদের থেকে মুক্ত পুরুষদের আরও বেশি করে আকৃষ্ট করে। সেই পরমেশ্বর ভগবান অবশ্য নির্বিশেষ বা নিরাকার নন, কেন না রস আস্বাদন করা কেবল সবিশেষ পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তা অত্যন্ত সুসংবদ্ধভাবে বর্ণনা করেছেন। এইভাবে সেই বিষয়টি সকলকেই আকৃষ্ট করে, এমন কি ব্রহ্ম-জ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার প্রয়াসী মুমুক্ষুদেরও তা আকৃষ্ট করে।

সংস্কৃত ভাষায় টিয়া পাখিকে বলা হয় শুক। এই শুক পক্ষী যখন তার বঙ্কিম চঞ্চু দিয়ে কোন পক্ক ফলের স্বাদ গ্রহণ করে, তখন সেই ফল আরও মধুর হয়ে ওঠে। বৈদিক কল্পবৃক্ষের এই সুপক্ক ফল তেমনই শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে বলে আরও মধুর হয়ে উঠেছে। শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত *শ্রীমদ্ভাগবত* যথাযথভাবে আবৃত্তি করতে পারেন বলে তাঁকে শুক পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করা হয় নি, সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উপযুক্ত করে তা প্রদান করার যোগ্যতার জন্যই তাঁকে শুক পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে এই বিষয়টি এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, যে কোনও নিষ্ঠাবান শ্রোতা যদি শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে তা শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করতে পারেন, যা হচ্ছে জড়জাগতিক রস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সুপক্ক ফলটি অপ্রাকৃত জগতের সর্বোচ্চ লোক কৃষ্ণলোক থেকে হঠাৎ পতিত হয় নি। পক্ষান্তরে, তা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে গুরু-শিষ্য-পরম্পরার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে এবং অক্ষতভাবে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। যে সমস্ত মূর্খ মানুষ পারমার্থিক পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ না করে পারমার্থিক জগতে সর্বোচ্চ রস রাসলীলার তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করে মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে স্তরে স্তরে এই পারমার্থিক তত্ত্ব উন্মোচন করেছেন। তাই যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য-হচ্ছে শুকদেব গোস্বামী যে সতর্কতার সঙ্গে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন সে কথা বিবেচনা করে *শ্রীমদ্ভাগবতের* মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা। ভাগবত-সম্প্রদায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে হবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উপযুক্ত প্রতিনিধির কাছ থেকে। যে সমস্ত মানুষ অর্থ উপার্জন করার জন্য *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করে, তারা কখনই শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর প্রতিনিধি নয়। এই ধরনের মানুষের কাজ হচ্ছে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করা। তাই এই ধরনের পেশাদারি ভাগবত-পাঠকদের ভাগবত পাঠ কখনই শোনা উচিত নয়। এই ধরনের মানুষেরা সাধারণত *শ্রীমদ্ভাগবতের* বিষয়বস্তুর গুরুত্ব স্তরে স্তরে হৃদয়ঙ্গম না করে সরাসরি *শ্রীমদ্ভাগবতের* সবচাইতে গোপনীয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে শুরু

করে। তারা সাধারণত সরাসরিভাবে ভগবানের রাসলীলা নিয়ে আলোচনা করে, যার পারমার্থিক তত্ত্ব মূর্খ লোকেরা বুঝতে পারে না। কিছু কিছু মানুষ ভগবানের এই লীলা-বিলাসকে অশ্লীল বলে মনে করে, আর কিছু লোক তাদের মূর্খ ভাষ্যের দ্বারা তা ঢাকবার চেষ্টা করে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করার কোন রকম বাসনাই তাদের নেই।

তাই রস সম্বন্ধে যারা জানতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাদের শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর ধারায় গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী গ্রহণ করতে হবে, কেন না শ্রীল শুকদেব গোস্বামীই হচ্ছেন *শ্রীমদ্ভাগবতের* আদি বক্তা এবং তিনি পারমার্থিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কতকগুলি বিষয়ী মানুষের মনোরঞ্জন করার জন্য তাঁর মনগড়া কতকগুলি কথা বলেননি। *শ্রীমদ্ভাগবত* এত সাবধানতার সঙ্গে প্রদান করা হয়েছে যে, ঐকান্তিক এবং নিষ্ঠাবান শ্রোতা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অথবা তাঁর আদর্শ প্রতিনিধির শ্রীমুখ থেকে এই অমৃতময় রস পান করার ফলে তৎক্ষণাৎ বৈদিক জ্ঞানের সুপক্ক ফল আস্বাদন করতে পারেন।

শ্লোক ৪

নৈমিষেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায়লোকায় সহস্রসমমাসত ॥ ৪ ॥

নৈমিষে—নৈমিষারণ্য নামক অরণ্যে; **অনিমিষ-ক্ষেত্র**—যাঁর চক্ষের পলক পড়ে না, সেই পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর বিশেষ প্রিয় স্থান; **ঋষয়ঃ**—ঋষিরা; **শৌনক-আদয়ঃ**—শৌনক আদি; **সত্রম্**—যজ্ঞ; **স্বর্গায়**—পরমেশ্বর ভগবান যিনি স্বর্গে বন্দিত হন; **লোকায়**—যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত, এবং যাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত; **সহস্র**—এক হাজার; **সমম্**—বছর; **আসত**—অনুষ্ঠান করেছিলেন।

অনুবাদ

এক সময় শৌনক আদি ঋষিরা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের প্রীতি সাধনের জন্য বিষ্ণু-তীর্থ নৈমিষারণ্যে সহস্র বর্ষ ব্যাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী তিনটি শ্লোক হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভূমিকাস্বরূপ। এখন এই মহান্ শাস্ত্রগ্রন্থের মূল বিষয়টি উপস্থাপন করা হচ্ছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রথম *শ্রীমদ্ভাগবত* শোনান, তারপর দ্বিতীয়বার তার পুনরাবৃত্তি হয় নৈমিষারণ্যে।

বায়বীয় তন্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে এই ব্রহ্মাণ্ডের কারিগর ব্রহ্মা একটি বিশাল চাকার কথা চিন্তা করেছিলেন, যা এই ব্রহ্মাণ্ডকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। সেই বিশাল চক্রের কেন্দ্রটি নৈমিষারণ্য নামক একটি বিশেষ স্থানে রয়েছে। তেমনই, *বরাহ পুরাণেও* নৈমিষারণ্য উল্লেখ রয়েছে, সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই স্থানে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করার ফলে আসুরিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ব্রাহ্মণেরা এই ধরনের যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের জন্য নৈমিষারণ্যকে পছন্দ করেন।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্তরা তাঁর প্রীতি সাধনের জন্য নানা রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। ভগবানের ভক্ত নিরন্তর ভগবানের সেবা করতে চান, কিন্তু যারা অত্যন্ত অধঃপতিত, তারা জড়জাগতিক সুখ-ভোগের প্রতি আসক্ত। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিসাধন ব্যতীত জড়জাগতিক স্তরে যে কাজই করা হোক না কেন, তার ফলে অনুষ্ঠানকারীর বন্ধনই কেবল বৃদ্ধি পায়। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত কর্মই যেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই সাধিত হয়। তার ফলে সকলের শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভ হয়।

মহান ঋষিরা সর্বদাই জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন, এবং শৌনক আদি ঋষিরা এই নৈমিষারণ্যে সমবেত হয়েছিলেন এক মহান্ এবং দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য। আত্মবিস্মৃত মানুষেরা শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভের যথার্থ পন্থা সম্বন্ধে অবগত নয় কিন্তু ঋষিরা সেই পন্থাটি সম্বন্ধে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অবগত, এবং তাই সমস্ত মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁরা সর্বদাই সেই সমস্ত কর্ম করতে উৎকণ্ঠিত থাকেন, যার ফলে জগতে শান্তি স্থাপিত হয়। তাঁরা সমস্ত জীবের যথার্থ সুহৃদ, এবং তাঁদের ব্যক্তিগত অনেক অসুবিধা হলেও তাঁরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় এবং জনসাধারণের মঙ্গল সাধনে যুক্ত থাকেন। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন একটি বিশাল বৃক্ষের মতো, এবং অন্য সকলে—স্বর্গের দেবতা, মানুষ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর এবং অন্য সমস্ত জীবেরা হচ্ছে সেই বৃক্ষটির শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-স্বরূপ। এই বৃক্ষটির মূলে জল সিঞ্চন করা হলে বৃক্ষটির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির আপনা থেকেই পুষ্টিসাধন হয়। কিন্তু যে-সমস্ত শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-মূল গাছটি থেকে বিচ্যুত, তারাই কেবল অতৃপ্ত থাকে। যে সমস্ত শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-মূল বৃক্ষটি থেকে বিচ্যুত, তাদের যতই জল সিঞ্চন করা হোক্ না কেন, তবুও তারা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। তেমনই মনুষ্য-সমাজ যখন বিচ্যুত শাখা-প্রশাখা এবং পত্রের মতো পরমেশ্বর ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন তাদের আর কোনভাবেই পুষ্টিসাধন করা যায় না, এবং যারা সেই চেষ্টা করে তারা কেবল তাদের শক্তিরই অপচয় করে।

আধুনিক জড়বাদী সমাজ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আর তাই সেই সমাজে নাস্তিক নেতাদের সমস্ত পরিকল্পনা প্রতি পদক্ষেপে ব্যর্থ হচ্ছে, তবুও তাদের জ্ঞান হচ্ছে না।

এই যুগে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে জেগে ওঠার পন্থা হচ্ছে সংঘবদ্ধভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা। সেই পন্থা এবং তার উপায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রদান করে গেছেন, এবং বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে যথার্থ শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভ করার জন্য তাঁর সেই শিক্ষা গ্রহণ করা। *শ্রীমদ্ভাগবতও* সেই উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, এবং তা আরও বিশদভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ৫

ত একদা তু মুনয়ঃ প্রাতর্হুতহুতাগ্নয়ঃ।
সৎকৃতং সূতমাসীনং পপ্রচ্ছুরিদমাদরাৎ ॥ ৫ ॥

ত—ঋষিরা ; **একদা**—একদিন ; **তু**—কিন্তু ; **মুনয়ঃ**—মুনিরা ; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে ; **হুত**—আহুতি দিয়ে ; **হুত-অগ্নয়ঃ**—হুতাগ্নি ; **সৎকৃতম্**—যথার্থ শ্রদ্ধা সহকারে ; **সূতম্**—সূত গোস্বামীকে ; **আসীনম্**—উপবিষ্ট ; **পপ্রচ্ছুঃ**—জিজ্ঞাসা করলেন ; **ইদম্**—এই বিষয়ে ; **আদরাৎ**—আদরের সঙ্গে।

অনুবাদ

একদিন প্রাতঃকালে সেই শৌনকাদি ঋষিরা হুতাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে সমাদৃত আসনে উপবিষ্ট শ্রীল সূত গোস্বামীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রাতঃকাল হচ্ছে পারমার্থিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। মহর্ষিরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বক্তাকে শ্রদ্ধা সহকারে ব্যাসাসন নামক উচ্চ-আসন প্রদান করেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন সমস্ত মানুষের আদি গুরু। অন্য সমস্ত গুরুদেব তাঁর প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হয়। যথার্থ প্রতিনিধি হচ্ছেন তিনি, যিনি যথাযথভাবে ব্যাসদেবের দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে পারেন। শ্রীল ব্যাসদেব *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে দান করেছিলেন এবং শ্রীল সূত গোস্বামী তা শ্রবণ করেছিলেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে। গুরু-পরম্পরার ধারায় ব্যাসদেবের সমস্ত আদর্শ প্রতিনিধিরা হচ্ছেন গোস্বামী। এই সমস্ত গোস্বামীরা সর্বতোভাবে তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করে পূর্ববর্তী আচার্যদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। গোস্বামীরা তাঁদের খেয়াল-খুশিমত ভাগবতের অর্থ বা কদর্থ করে বক্তৃতা দেন না। পক্ষান্তরে, তাঁরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পূর্ববর্তী যে-সমস্ত আচার্যরা অবিকৃতভাবে এই পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করে গেছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের কার্য সম্পাদন করেন।

ভাগবতের শ্রোতারা স্পষ্টভাবে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বক্তার কাছে প্রশ্ন করতে পারেন, তবে তা কখনই উদ্ধত মনোভাব নিয়ে করা উচিত নয়। ভাগবতের বক্তা এবং সেই বিষয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিনীতভাবে প্রশ্ন করা কর্তব্য। সেই পন্থা *ভগবদ্গীতাতেও* নির্দেশিত হয়েছে। যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টার কাছে বিনীতভাবে শ্রবণ করার মাধ্যমে এই অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করতে হয়। তাই নৈমিষারণ্যের ঋষিরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে বক্তা শ্রীল সূত গোস্বামীকে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্লোক ৬

ঋষয় ঊচুঃ

ত্বয়া খলু পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘ।
আখ্যাতান্যপ্যধীতানি ধর্মশাস্ত্রাণি যান্যুত ॥ ৬ ॥

ঋষয়ঃ—ঋষিরা; **ঊচুঃ**—বললেন; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **খলু**—নিঃসন্দেহে; **পুরাণানি**—পুরাণসমূহ; **স-ইতিহাসানি**—ইতিহাস সহ; **চ**—এবং; **অনঘ**—নিষ্পাপ; **অ্যাখ্যাতানি**—ব্যাখ্যা করা হয়েছে; **অপি**—যদিও; **অধীতানি**—অধ্যয়ন করেছেন; **ধর্ম-শাস্ত্রাণি**—ধর্মশাস্ত্রসমূহ; **যানি**—এই সমস্ত; **উত**—বলেছেন।

অনুবাদ

ঋষিরা বললেনঃ হে পরম শ্রদ্ধেয় সূত গোস্বামী, আপনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ। আপনি মহাভারত আদি ইতিহাস সহ অষ্টাদশ পুরাণ এবং সমস্ত ধর্মশাস্ত্র সদ্গুরুর কাছে অধ্যয়ন করেছেন। শুধু তা-ই নয়, তা আপনি ব্যাখ্যাও করেছেন।

তাৎপর্য

গোস্বামী অথবা শ্রীল ব্যাসদেবের উপযুক্ত প্রতিনিধিকে অবশ্যই সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে। কলিযুগের চারটি মুখ্য পাপকর্ম হচ্ছেঃ ১) অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ, ২) পশু-হত্যা, ৩) আসব পান, ৪) সব রকমের দ্যূতক্রীড়া। শ্রীল ব্যাসদেবের আসন, ব্যাসাসনে উপবেশন করার আগে গোস্বামীকে অবশ্যই এই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে। যার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ নয় এবং যে পূর্বোল্লিখিত ঐ সমস্ত পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়, তাকে কখনই ব্যাসাসনে বসতে দেওয়া উচিত নয়। তাকে কেবল এই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হলেই চলবে না, তাকে অবশ্যই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পারদর্শী হতে হবে। অষ্টাদশ পুরাণও হচ্ছে বেদের অংশ; আর মহাভারত অথবা রামায়ণ আদি ইতিহাসও হচ্ছে বেদের অংশ। আচার্য অথবা গোস্বামীকে অবশ্যই এই সমস্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে যথার্থভাবে অভিজ্ঞ হতে হবে। তা শ্রবণ করা এবং ব্যাখ্যা করা পাঠ করার থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেবল শ্রবণ এবং

বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এই শাস্ত্রজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করাকে বলা হয় কীর্তন। এই দুটি পন্থা—শ্রবণ এবং কীর্তন হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি করার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যিনি যথার্থ সদ্‌গুরুর কাছে বিনীতভাবে শ্রবণ করার মাধ্যমে এই অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনিই কেবল সেই বিষয় যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

শ্লোক ৭

যানি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
অন্যে চ মুনয়ঃ সূত পরাবরবিদো বিদুঃ ॥ ৭ ॥

যানি—সেই সব; **বেদ-বিদাম্**—বেদবিদ্; **শ্রেষ্ঠঃ**—সর্বোত্তম; **ভগবান্**— পরমেশ্বর ভগবানের অবতার; **বাদরায়ণঃ**—ব্যাসদেব; **অন্যে**—অন্য সকলে; **চ**—এবং; **মুনয়ঃ**—মুনি-ঋষিরা; **সূত**—হে সূত গোস্বামী; **পরাবর-বিদঃ**—বিদ্বান পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি ভৌতিক এবং আধিভৌতিক জ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ; **বিদুঃ**—যিনি জানেন।

অনুবাদ

হে সর্বপ্রবীণ বেদান্তবিদ সূত গোস্বামী, আপনি ভগবানের অবতার ব্যাসদেবের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, এবং যে সমস্ত ঋষিরা ভৌতিক এবং আধিভৌতিক জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করেছেন তাদের কাছ থেকেও আপনি জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ব্রহ্মসূত্র বা বাদরায়ণ বেদান্ত-সূত্রের যথার্থ ভাষ্য। একে যথার্থ বলা হচ্ছে, কেন না ব্যাসদেব হচ্ছেন বেদান্ত-সূত্র এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* বা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারমর্ম—এই দুইয়ের প্রণেতা। ব্যাসদেব ছাড়াও অন্য কয়েকজন ঋষি ছ'টি বৈদিক দর্শন প্রণয়ন করে গেছেন। তাঁরা হচ্ছেন—গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি এবং অষ্টাবক্র। আস্তিকাবাদ পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বেদান্ত-সূত্রে, কিন্তু অন্যান্য দর্শনগুলি দার্শনিক কল্পনা-প্রসূত জ্ঞান, সেগুলিতে সর্বকারণের পরম কারণ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করা হয়নি। সব ক'টি দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে যথার্থভাবে অবগত হওয়ার পরেই ব্যাসাসনে বসা যায়, যাতে অন্য সমস্ত মতবাদ খণ্ডন করে *শ্রীমদ্ভাগবতের* আস্তিকাবাদ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়। শ্রীল সূত গোস্বামী ছিলেন যথার্থ শিক্ষক, এবং তাই নৈমিষারণ্যের ঋষিরা তাঁকে ব্যাসদেবের উচ্চ-আসন প্রদান করেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেবকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে কেন না তিনি হচ্ছেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার।

শ্লোক ৮

বেত্থ ত্বং সৌম্য তৎসর্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ৮ ॥

বেত্থ—আপনি খুব ভালভাবে জানেন; **ত্বম্**—আপনি; **সৌম্য**—সরল এবং নির্মল যে পুরুষ; **তৎ**—তাঁহারা; **সর্বম্**—সমস্ত; **তত্ত্বতঃ**—যথার্থ; **তৎ**—তাঁহাদের; **অনুগ্রহাৎ**—অনুগ্রহের প্রভাবে; **ব্রূয়ুঃ**—বলবেন; **স্নিগ্ধস্য**—বিনীত এবং শ্রদ্ধাশীল; **শিষ্যস্য**—শিষ্যের; **গুরবঃ**—গুরুদেবেরা; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **অপি উত**—সমৃদ্ধ।

অনুবাদ

যেহেতু আপনি শ্রদ্ধাশীল এবং বিনীত, তাই আপনার গুরুদেবেরা বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন। কেন না, স্নিগ্ধ স্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ প্রীতিশীল শিষ্যের কাছেই গুরুবর্গ অতি নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করেন।

তাৎপর্য

পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধিলাভের যথার্থ উপায় হচ্ছে শ্রীল গুরুদেবের সন্তুষ্টিবিধান করা এবং তার ফলে তাঁর আন্তরিক আশীর্বাদ লাভ করা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত গুর্বষ্টকমে বলেছেন ঃ

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

অর্থাৎ, "যিনি প্রীত হলে পরমেশ্বর ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং যিনি অসন্তুষ্ট হলে জীবের আর কোন গতি থাকে না, আমার সেই পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" তাই শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত বিনীতভাবে সদ্গুরুর সেবা করা। শ্রীল সূত গোস্বামী আদর্শ শিষ্যের এই সমস্ত গুণাবলী প্রদর্শন করছিলেন, এবং তাই শ্রীল ব্যাসদেব আদি তাঁর সমস্ত তত্ত্বদ্রষ্টা গুরুদেবের কাছ থেকে বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে শ্রীল সূত গোস্বামী হচ্ছেন একজন যথার্থ সদ্গুরু। তাই তাঁরা তাঁর শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

তত্র তত্রাঞ্জসায়ুষ্মন্ ভবতা যদ্বিনিশ্চিতম্।
পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্নঃ শংসিতুমর্হসি ॥ ৯ ॥

তত্র—উহার; **তত্র**—উহার; **অঞ্জসা**—সহজবোধ্য; **আয়ুষ্মন্**—দীর্ঘ আয়ুসম্পন্ন; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **যৎ**—যা; **বিনিশ্চিতম্**—নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে:

পুংসাম্—জনসাধারণের জন্য; **একান্ততঃ**—সম্পূর্ণরূপে; **শ্রেয়ঃ**—পরম মঙ্গল; **তৎ**—তাহা; **নঃ**—আমাদের; **শংসিতুম্**—বিশ্লেষণ করতে; **অর্হসি**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

হে আয়ুষ্মন্! আপনি জনসাধারণের পরম মঙ্গল কিভাবে সাধিত হয়, তা সহজবোধ্যভাবে আমাদের কাছে শোনান।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় আচার্য উপাসনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আচার্য এবং গোস্বামীরা সর্বদাই জনসাধারণের মঙ্গল চিন্তায় মগ্ন থাকেন, বিশেষ করে তাঁদের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য। পারমার্থিক মঙ্গল সাধিত হলে পার্থিব হিত আপনা থেকেই সাধিত হয়ে যায়। তাই আচার্যরা জনসাধারণের পারমার্থিক মঙ্গলের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কলিযুগের মানুষদের অধঃপতিত অবস্থা দর্শন করে ঋষিরা সূত গোস্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম প্রদান করতে, কেন না এই কলিযুগের মানুষেরা সম্পূর্ণভাবে অধঃপতিত। তাই ঋষিরা জনসাধারণের হিত-সাধনের জন্য পরম মঙ্গল সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। কলিযুগের মানুষের অধঃপতিত অবস্থা পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১০

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ ॥ ১০ ॥

প্রায়েণ—প্রায় সর্বদা; **অল্প**—অল্প; **আয়ুষঃ**—আয়ু; **সভ্য**—জ্ঞানবান সমাজের সদস্য; **কলৌ**—এই কলিযুগে; **অস্মিন্**—এখানে; **যুগে**—যুগে; **জনাঃ**—জনসাধারণ; **মন্দাঃ**—অলস; **সুমন্দ-মতয়ঃ**—অত্যন্ত মন্দ গতি; **মন্দ-ভাগ্যাঃ**—দুর্ভাগ্য; **হিঃ**—এবং সর্বোপরি; **উপদ্রুতাঃ**—রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত।

অনুবাদ

হে মহাজ্ঞানী, এই কলিযুগের মানুষেরা প্রায় সকলেই অল্পায়ু। তারা কলহপ্রিয়, অলস, মন্দ গতি, ভাগ্যহীন এবং সর্বোপরি তারা নিরন্তর রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্তরা সর্বদাই জনসাধারণের পারমার্থিক মঙ্গলসাধনের জন্য ব্যগ্র থাকেন। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা যখন কলিযুগের মানুষদের অবস্থা বিশ্লেষণ করলেন, তখন তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন যে, এই যুগের মানুষদের আয়ু হবে অত্যন্ত কম।

কলিযুগের মানুষদের আয়ু অল্প হওয়ার কারণ খাদ্যাভাব নয় তার কারণ হচ্ছে অনিয়ম এবং অনাচার। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জীবন যাপন করলে, সাদাসিধে খাদ্য আহার করলে যে কোনও মানুষ সুস্থ ও সরলভাবে জীবনধারণ করতে পারে। অত্যাচার, অত্যধিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, অন্যের করুণার উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং কৃত্রিমভাবে জীবনের মান উন্নত করার চেষ্টা মানুষের জীবনী-শক্তি শোষণ করে নেয়। তাই তাদের আয়ু কমে যায়।

এই যুগের মানুষেরা অত্যন্ত অলস, তারা কেবল জাগতিক বিষয়েই অলস নয়,পারমার্থিক জ্ঞানলাভের বিষয়েও তারা অত্যন্ত অলস। মানব জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করা। অর্থাৎ, মানুষের জানা উচিত যে সে কে, এই জড় জগৎ কি এবং পরম সত্য কি। মনুষ্য জীবন হচ্ছে একটি অপূর্ব সুন্দর সুযোগ, যার মাধ্যমে জীব এই জড় জগতে বেঁচে থাকার সংগ্রামরূপী সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার সমাপ্তি সাধন করতে পারে এবং তার নিত্য আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু কু-শিক্ষার প্রভাবে, মানুষদের আজ আর আত্মজ্ঞান লাভের কোন রকম বাসনা নেই। তারা যদি সে সম্বন্ধে জানতেও পারে, দুর্ভাগ্যবশত তারা কতকগুলি কপট প্রচারকের দ্বারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়।

এই কলিযুগে মানুষ কেবল বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থা এবং দলের শিকারই হচ্ছে না, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বিভিন্ন রকমের প্রলোভনের দ্বারাও বিপথগামী হচ্ছে। যেমন সিনেমা, অনর্থক খেলাধুলা, জুয়া, ক্লাব, জড় জাগতিক গ্রন্থাগার, অসৎ সঙ্গ, ধূমপান, আসব পান, প্রতারণা, চুরি, বাটপাড়ি ইত্যাদি। তাদের মন এই ধরনের বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে সর্বদাই বিচলিত এবং উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। এই যুগে অনেক অসৎ মানুষ তাদের মনগড়া নানা রকম ধর্ম-বিশ্বাস তৈরি করে, যা শাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, এবং ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রতি আসক্ত বিষয়ী মানুষেরা এই ধরনের সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরিণামে ধর্মের নামে এত পাপকার্য হতে থাকে যে মানুষের মনের শান্তি এবং দেহের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। আজকাল আর কেউ ব্রহ্মচর্য পালন করে না। আর গৃহস্থরাও গৃহস্থ আশ্রমের বিধি-বিধানগুলি অনুসরণ করে না। তার ফলে এই ধরনের গৃহস্থ আশ্রম থেকে আগত তথাকথিত সমস্ত বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীরা সহজেই বিপথগামী হয়। এই কলিযুগের সমস্ত আবহাওয়া অবিশ্বাসে পূর্ণ। মানুষেরা পারমার্থিক জীবনের প্রতি মোটেই উৎসাহী নয় এবং পারমার্থিক বিষয়ের প্রতি তারা কোন রকম গুরুত্ব দেয় না। জড় ইন্দ্রিয়-তর্পণই হচ্ছে এখনকার সভ্যতার মাপকাঠি। এই ধরনের জড় সভ্যতা সংরক্ষণ করার জন্য মানুষ অত্যন্ত জটিল জাতি এবং গোষ্ঠী তৈরি করেছে, এবং তাদের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ, বিবাদ লেগেই রয়েছে। আজকের মানব-সমাজের নীতিবোধ এত বিকৃত হয়ে গেছে যে মানুষকে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সমস্ত অধঃপতিত জীবদের জড়

জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে ব্যগ্র ছিলেন, তাই তাঁরা এখানে শ্রীল সূত গোস্বামীকে তার নিরাময়ের উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন।

শ্লোক ১১

ভূরীণি ভূরিকর্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
অতঃ সাধোঽত্র যৎসারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া।
ব্রূহি ভদ্রায়ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ১১ ॥

ভূরীণি—বহুবিধ; **ভূরি**—বিবিধ; **কর্মাণি**—কর্তব্য-কর্ম; **শ্রোতব্যানি**—শ্রবণযোগ্য শাস্ত্রসমূহ; **বিভাগশঃ**—বিভিন্ন বিভাগক্রমে; **অতঃ**—তাই; **সাধো**—হে সাধু; **অত্র**—এতাদৃশ; **যৎ**—যা; **সারম্**—সার; **সমুদ্ধৃত্য**—বাছাই করে সংগৃহীত হয়েছে; **মনীষয়া**—তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা; **ব্রূহি**—দয়া করে আমাদের বলুন; **ভদ্রায়**—মঙ্গলের জন্য; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **যেন**—যার দ্বারা; **আত্মা**—আত্মা; **সুপ্রসীদতি**—সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়।

অনুবাদ

বহুবিধ শাস্ত্র রয়েছে এবং সেই সমস্ত শাস্ত্রে নানা রকমের কর্তব্য-কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা বহু বছর ধরে বিভাগক্রমে পাঠ করার ফলে কেবল জানতে পারা যায়। তাই হে মহর্ষি, দয়া করে আপনি সেই সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য বিশ্লেষণ করে শোনান, যাতে তাদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে সুপ্রসন্ন হতে পারে।

তাৎপর্য

আত্মা জড় পদার্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। তা চিন্ময়, এবং তাই সব রকমের জড় পরিকল্পনার দ্বারা কখনই আত্মার তৃপ্তিসাধন করা যায় না। সমস্ত শাস্ত্রীয় এবং পারমার্থিক নির্দেশগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মার সন্তুষ্টি বিধান করা। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন ধরনের জীবদের জন্য বিভিন্ন পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। এইভাবে অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশ হয়েছে। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে কর্তব্য-কর্ম অনুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে। কলিযুগের মানুষদের অধঃপতিত অবস্থার কথা বিবেচনা করে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা শ্রীল সূত গোস্বামীকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন এই সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম বিশ্লেষণ করেন। কেন না এই যুগের অধঃপতিত জীবদের পক্ষে বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম অবলম্বনপূর্বক সমস্ত শাস্ত্রের শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করে পরম পুরুষার্থ সাধন করা সম্ভব হবে না।

বর্ণাশ্রম সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু কলিযুগের প্রভাবে এই বর্ণাশ্রম অনুশীলন করা সম্ভব নয়। এই যুগের

জনসাধারণের পক্ষে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার নির্দেশ অনুসারে তাদের পরিবারের সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব নয়। এই যুগের সমস্ত আবহাওয়া স্বাস্থ্য-বিরুদ্ধ ভাবধারায় পরিপূর্ণ এবং তার ফলে সহজেই বোঝা যায় যে, এই যুগে সাধারণ মানুষদের পক্ষে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা অত্যন্ত কঠিন। ঋষিরা যে কেন এই বিষয়ে সূত গোস্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন তা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ১২

সূত জানাসি ভদ্রং তে ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
দেবক্যাং বসুদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া ॥ ১২ ॥

সূত—হে সূত গোস্বামী; **জানাসি**—আপনি জানেন; **ভদ্রম্ তে**—সর্বতোভাবে আপনার মঙ্গল হোক; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাত্বতাম্**—শুদ্ধ ভক্তদের; **পতিঃ**—রক্ষাকর্তা; **দেবক্যাম্**—দেবকীর গর্ভে; **বসুদেবস্য**—বসুদেবের দ্বারা; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **যস্য**—উদ্দেশ্যে; **চিকীর্ষয়া**—অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী! আপনার সর্ববিধ মঙ্গল হোক। আপনিও অবগত আছেন যে কি উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবান বসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান হচ্ছেন তিনি, যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্যের পূর্ণ অধীশ্বর। তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের রক্ষা করেন। ভগবান যদিও সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তবুও তিনি তাঁর ভক্তের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। সৎ কথাটির অর্থ হচ্ছে পরম সত্য। আর যে সমস্ত মানুষ সেই পরম সত্যের সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় 'সাত্বত'। আর পরমেশ্বর ভগবানের, যিনি এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তদের রক্ষা করেন, তাঁর আরেক নাম 'সাত্বতাং পতিঃ।' ভদ্রম্ অর্থাৎ 'আপনার সর্ববিধ মঙ্গল হোক,' কথাটির মাধ্যমে শ্রীল সূত গোস্বামীর কাছ থেকে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জানবার জন্য ঋষিদের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পত্নী দেবকীর সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বসুদেব হচ্ছেন চিন্ময় স্থিতির প্রতীক, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান প্রকাশিত হন।

শ্লোক ১৩

তন্নঃ শুশ্রূষমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুম্।
যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥ ১৩ ॥

তৎ—যে সমস্ত ; **নঃ**—আমাদের ; **শুশ্রূষমাণানাম্**—শ্রবণাভিলাষী ; **অর্হসি**—কর্তব্য ; **অঙ্গ**—হে সূত গোস্বামী ; **অনুবর্ণিতুম্**—পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্ণনা করা ; **যস্য**—যাঁর ; **অবতারঃ**—অবতার ; **ভূতানাম্**—জীবসমূহের ; **ক্ষেমায়**—মঙ্গলের জন্য ; **চ**—এবং ; **ভবায়**—উন্নতিসাধন ; **চ**—এবং।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী ! যাঁর অবতার এবং আবির্ভাব সমস্ত জীবের মঙ্গল এবং সমৃদ্ধির জন্য হয়ে থাকে, আমরা সেই বাসুদেবের লীলাসমূহ শ্রবণ করতে অভিলাষী। আপনি অনুগ্রহ করে গুরু-পরম্পরায় লব্ধ সেই জ্ঞান আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করুন, কেন না তা শ্রবণ ও কীর্তনে উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয়।

তাৎপর্য

পরম সত্য সম্বন্ধে অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করার পন্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই বাণী শ্রবণ করার প্রথম যোগ্যতা হচ্ছে যে শ্রোতাকে তা শ্রবণ করার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হতে হবে। আর তার বক্তাকে পূর্বতন আচার্যদের পরম্পরায় যুক্ত হতে হবে। যে সমস্ত মানুষ জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত, তাদের পক্ষে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় এই চিন্ময় বাণী হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। সদ্‌গুরুর নির্দেশনায় শিষ্য ধীরে ধীরে পবিত্র হয়। তাই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারায় প্রবাহিত পরম তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করাই হচ্ছে চিন্ময় জ্ঞান লাভের পন্থা। সূত গোস্বামী এবং নৈমিষারণ্যের ঋষিরা—উভয়ের ক্ষেত্রেই এই যোগ্যতাগুলি যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়েছে, কেন না শ্রীল সূত গোস্বামী শ্রীল ব্যাসদেবের ধারায় এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সকলেই ছিলেন সেই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভে ঐকান্তিকভাবে প্রয়াসী। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলাবিলাস, তাঁর জন্ম, আবির্ভাব এবং অপ্রকট, তাঁর রূপ, তাঁর নাম ইত্যাদি সমন্বিত এই অপ্রাকৃত বিষয় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা তাঁরা অর্জন করেছিলেন। এই ধরনের আলোচনা সমস্ত মানুষকে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

শ্লোক ১৪

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥ ১৪ ॥

আপন্নঃ—আবদ্ধ হয়ে ; **সংসৃতিম্**—জন্ম এবং মৃত্যুর আবর্তে ; **ঘোরাম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ; **যৎ**—যা ; **নাম**—ভগবানের অপ্রাকৃত নাম ; **বিবশঃ**—অচেতনভাবে ; **গৃণন্**—উচ্চারণ করে ; **ততঃ**—তার ফলে ; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ ; **বিমুচ্যেত**—মুক্ত হয় ; **যৎ**—যা ; **বিভেতি**—মহাকাল ; **স্বয়ম্**—সাক্ষাৎ ; **ভয়ম্**—ভয় স্বয়ং।

অনুবাদ

জন্ম-মৃত্যুর ভয়ঙ্কর আবর্তে আবদ্ধ মানুষ বিবশ হয়েও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে করতে অচিরেই সেই সংসারচক্র থেকে মুক্ত হয়, সেই নামে স্বয়ং মহাকালও ভীত হন।

তাৎপর্য

বাসুদেব অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, সবকিছুর পরম নিয়ন্তা। এই জগতে এমন কেউ নেই যিনি সর্বশক্তিমান ভগবানের ভয়ে ভীত নন। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস আদি বহু বড় বড় অসুর ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী জীব, কিন্তু তারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের হাতে নিহত হয়েছিল। সর্বশক্তিমান বাসুদেব তাঁর দিব্য নামে তাঁর সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। সবকিছুই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সব কিছুর যথার্থ পরিচয় তাঁরই মধ্যে বর্তমান। এখানে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং ভয় অর্থাৎ মহাকাল শ্রীকৃষ্ণের নামকে ভয় করেন। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্ন। তাই শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণেরই মতো সর্বশক্তিমান। তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই,তাই যে কেউই মহা বিপদেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। বিবশ হয়ে অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বাধ্য হয়েও যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করেন, তা তাঁকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে পারে।

শ্লোক ১৫

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥ ১৫ ॥

যৎ—যাঁর; **পাদ**—শ্রীপাদপদ্ম; **সংশ্রয়াঃ**—যাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; **সূত**—হে সূত গোস্বামী; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিরা; **প্রশমায়নাঃ**—ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **পুনন্তি**—পবিত্র হয়; **উপস্পৃষ্টাঃ**—কেবলমাত্র সঙ্গ প্রভাবেই; **স্বর্ধুনী**—পবিত্র গঙ্গা নদী; **আপঃ**—জল; **অনুসেবয়া**—স্পর্শন, অবগাহন আদি সেবার দ্বারা।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী, যে সমস্ত মহর্ষিরা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গ-প্রভাবে অর্থাৎ দর্শন মাত্রই জীব পবিত্র হয়, কিন্তু সুরধুনী গঙ্গার জল সাক্ষাৎ সেবা অর্থাৎ স্পর্শন, অবগাহন আদি করার পরেই কেবল মানুষকে পবিত্র করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তের পাবনী শক্তি গঙ্গার থেকেও অধিক। দীর্ঘকাল ধরে গঙ্গার জলে অবগাহন করলে এবং গঙ্গার জল পান করলে পারমার্থিক মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কৃপা যে কোন জীবকে তৎক্ষণাৎ সব রকমের কলুষ থেকে মুক্ত করতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, স্ত্রী, বৈশ্য অথবা শূদ্র আদি যে কোনও মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন এবং তার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করা। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা এবং তাই তাঁদের প্রভুপাদ এবং বিষ্ণুপাদ আদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতিনিধি। তাই কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শিষ্যত্ব বরণ করে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পবিত্র হন। ভগবানের এই শুদ্ধ ভক্তদের ভগবানেরই মতো সম্মান করা হয়, কেন না তাঁরা ভগবানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সেবায় যুক্ত। ভগবান সব সময়ই চান যে এই জড় জগতের অধঃপতিত জীবেরা যেন তাঁর কাছে ফিরে যায়, এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সেই কার্যটি সম্পাদন করেন। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তদের শাস্ত্রে 'সাক্ষাৎ হরি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শুদ্ধ ভক্তের নিষ্ঠাবান শিষ্যরা তাঁদের গুরুদেবকে পরমেশ্বর ভগবানেরই সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন ; কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই মনে করেন যে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের দাসানুদাস। এটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির পথ।

শ্লোক ১৬

কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্মণঃ ।
শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদ্যশঃ কলিমলাপহম্ ॥ ১৬ ॥

কঃ—কে ; **বা**—বরঞ্চ ; **ভগবতঃ**—ভগবানের ; **তস্য**—তার ; **পুণ্য**—পুণ্য ; **শ্লোকেড্য**—উত্তম শ্লোকের দ্বারা আরাধ্য ; **কর্মণঃ**—কর্মসমূহ ; **শুদ্ধিকামঃ**—সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী ; **ন**—না ; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করে ; **যশঃ**—যশ ; **কলি**—কলিযুগে ; **মলাপহম্**—কলিযুগের কলুষ নাশকারী।

অনুবাদ

কলিযুগের পাপ-পঙ্কিল অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী এমন কে আছে যে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ করতে অনিচ্ছুক ?

তাৎপর্য

এই কলিযুগ হচ্ছে সব চাইতে অধঃপতিত যুগ, কেন না এই যুগে সকলে অত্যন্ত কলহপরায়ণ। কলিযুগের মানুষের প্রবৃত্তি এতই জঘন্য যে একটু ভুল বোঝাবুঝির ফলেই তারা প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হয়। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ, যাঁরা নিজেদের ধনসম্পদ বৃদ্ধির বাসনারহিত এবং যাঁরা সব রকমের সকাম কর্ম এবং জল্পনা-কল্পনা প্রসূত জ্ঞানের প্রতি নিরাসক্ত তাঁরাই কেবল এই অত্যন্ত জটিল যুগের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য। আজকালকার নেতারা শান্তি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বসবাস করার প্রয়াসের কথা বলে, কিন্তু ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার অতি সরল পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমেই যে কেবল সমস্ত জগৎ জুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। পক্ষান্তরে, এই ধরনের নেতারা ভগবানের মহিমা প্রচারের বিরোধী। অর্থাৎ, সেই সমস্ত নেতারা ভগবানের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে চায়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নামে এই ধরনের নেতারা প্রতি বছরই নানা রকমের পরিকল্পনা করে, কিন্তু ভগবানের দুরতিক্রম্য প্রকৃতির প্রভাবে সেই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি নিরন্তর ব্যর্থ হয়। তাদের শান্তি এবং সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার সব রকম প্রচেষ্টাগুলি যে ব্যর্থ হচ্ছে সেটা দেখার দৃষ্টিশক্তিও তাদের নেই। কিন্তু এখানে সেই বাধা অতিক্রম করার উপায়ের আভাস দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি যথার্থই শান্তি চাই, তা হলে আমাদের পরমেশ্বর ভগবানকে জানার পথ উন্মুক্ত করতে হবে এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা অনুসারে তাঁর পবিত্র কার্যকলাপ কীর্তন করার মাধ্যমে তাঁর মহিমা প্রচার করতে হবে।

শ্লোক ১৭

তস্য কর্মাণ্যুদারাণি পরিগীতানি সূরিভিঃ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ ॥ ১৭ ॥

তস্য—তাঁর; **কর্মাণি**—অপ্রাকৃত কার্যকলাপ; **উদারাণি**—মহান; **পরিগীতানী**—সংকীর্তিত; **সূরিভিঃ**—মহাত্মাদের দ্বারা; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **নঃ**—আমাদের; **শ্রদ্দধানানাং**—শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করতে প্রস্তুত; **লীলয়া**—লীলাবিলাস; **দধতঃ**—আবির্ভূত হন; **কলাঃ**—অবতারসমূহ।

অনুবাদ

তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ অত্যন্ত মহৎ এবং উদার, এবং নারদ আদি মহান ঋষিরা তা কীর্তন করেন। তা শ্রবণ করার জন্য আমরা অত্যন্ত আকুল হয়েছি, দয়া করে আপনি বিভিন্ন অবতারে তাঁর বিভিন্ন লীলাবিলাসের কথা আমাদের বলুন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান কখনই নিষ্ক্রিয় নন, যে কথা কিছু অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা বলে থাকে। তাঁর কার্যকলাপ মহৎ এবং উদার। তিনি যে জড় এবং চিন্ময় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তা অত্যন্ত অদ্ভুত এবং সেগুলি সব রকম বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। নারদ মুনি, ব্যাস, বাল্মীকি, দেবল, অসিত, মধ্ব, শ্রীচৈতন্য, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক, শ্রীধর, বিশ্বনাথ, বলদেব, ভক্তিবিনোদ, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী এবং অন্যান্য সমস্ত তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা সে সম্বন্ধে বর্ণনা করে গেছেন। ভগবানের জড় এবং চিন্ময় উভয় সৃষ্টিই শ্রী, ঐশ্বর্য এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ, কিন্তু চিন্ময় জগৎ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় হওয়ার ফলে আরও অধিক চমৎকার। অপ্রাকৃত জগতের বিকৃত প্রতিফলন এই জড় জগতের প্রকাশ হয় ক্ষণকালের জন্য, এবং তাকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যে সমস্ত অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মেকি জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয় তারাই কেবল এই জড় জগতের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এই ধরনের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, এবং তারা মনে করে যে এই জড় জগতের মিথ্যা প্রকাশই হচ্ছে সব কিছু। কিন্তু ব্যাসদেব এবং নারদ প্রমুখ মহর্ষিদের দ্বারা পরিচালিত বুদ্ধিমান মানুষেরা জানেন যে ভগবদ্ধাম হচ্ছে আরও আনন্দদায়ক, আরও বিশাল এবং নিত্য আনন্দ এবং জ্ঞানময়। যারা ভগবানের অপ্রাকৃত ধাম এবং ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত নয়, তাদের প্রতি কৃপা করেই ভগবান এই জগতে অবতরণ করে, তাঁর সঙ্গ করার ফলে যে কি অচিন্তনীয় আনন্দ উপভোগ করা যায় তা প্রদর্শন করেন। এই ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি এই জড় জগতের বদ্ধ জীবদের আকৃষ্ট করেন। এই ধরনের বদ্ধ জীবদের কেউ কেউ জড় ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের মিথ্যা প্রচেষ্টায় লিপ্ত, আর অন্যরা 'নেতি নেতি' করে চিন্ময় জগতে তাদের যথার্থ আনন্দময় জীবনকে প্রত্যাখ্যান করছে। এই ধরনের অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের বলা হয় কর্মী এবং জ্ঞানী। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর মানুষদের ঊর্ধ্বে রয়েছেন প্রকৃত তত্ত্বদ্রষ্টা মহাত্মা, যাঁদের বলা হয় সাত্বত বা ভক্ত, যারা কোন রকম অর্থহীন জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত নন, অথবা মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের প্রয়াসীও নন। তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত এবং তার ফলে তাঁরা কর্মী এবং জ্ঞানীদের অজ্ঞাত যে সর্বোচ্চ পারমার্থিক কল্যাণ, তা সাধন করেন।

জড় এবং চিন্ময় জগতে পরম নিয়ন্তারূপে পরমেশ্বর ভগবানের বহু অবতার রয়েছে। ব্রহ্মা, রুদ্র, মনু, পৃথু এবং ব্যাসদেব হচ্ছেন তাঁর জড়া শক্তির আবেশ-অবতার; কিন্তু রাম, নৃসিংহ, বরাহ এবং বামন আদি অবতারেরা হচ্ছেন তাঁর চিন্ময় অবতার। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস, এবং তাই তিনিই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।

শ্লোক ১৮

অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলা বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া ॥ ১৮ ॥

অথ—অতএব; **আখ্যাহি**—বলুন; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ধীমন্**—হে বুদ্ধিমান; **অবতার**—অবতারসমূহ; **কথাঃ**—বৃত্তান্ত; **শুভাঃ**—মঙ্গলময়; **লীলা**—অপ্রাকৃত কার্যকলাপ; **বিদধতঃ**—অনুষ্ঠিত; **স্বৈরম্**—স্বতন্ত্রভাবে; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **আত্ম**—স্বীয়; **মায়য়া**—শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

হে মহাজ্ঞানী সূত গোস্বামী, দয়া করে আপনি আমাদের কাছে পরমেশ্বর ভগবানের অসংখ্য অবতারের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কথা বর্ণনা করুন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম মঙ্গলময় লীলাবিলাস সম্পাদিত হয় তাঁর চিৎ-শক্তি যোগমায়ার দ্বারা।

তাৎপর্য

জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য পরমেশ্বর ভগবান হাজার হাজার রূপে অবতরণ করেন এবং তাঁর এই চিন্ময় রূপে এই সমস্ত চিন্ময় কার্যকলাপ পরম মঙ্গলময়। সেই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদিত হওয়ার সময় যাঁরা উপস্থিত থাকেন তাঁরা এবং যাঁরা সেই সমস্ত কার্যকলাপের অপ্রাকৃত বর্ণনা শ্রবণ করেন তাঁদের উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয়।

শ্লোক ১৯

বয়ং তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ১৯ ॥

বয়ম্—আমরা; **তু**—কিন্তু; **ন**—না; **বিতৃপ্যামঃ**—তৃপ্ত হব না; **উত্তম-শ্লোক**—পরমেশ্বর ভগবান, উত্তম শ্লোক বা অপ্রাকৃত প্রার্থনার দ্বারা যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়; **বিক্রমে**—বিক্রমপূর্ণ লীলাবিলাস; **যৎ**—যাহা; **শৃণ্বতাম্**—নিরন্তর শ্রবণ করার ফলে; **রস-জ্ঞানাম্**—রসিকদের; **স্বাদু**—আস্বাদন করেন; **স্বাদু**—সুস্বাদু; **পদে পদে**—প্রতি মুহূর্তে।

অনুবাদ

উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত হন যে পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত লীলাকথা যতই আমরা শ্রবণ করি না কেন, আমাদের তৃপ্তি হবে না। যাঁরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

হওয়ার অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করেছেন তাঁরা নিরন্তর তাঁর লীলাবিলাসের রস আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের সঙ্গে জড় জগতের গল্প-উপন্যাসের অথবা ইতিহাসের একটা মস্ত বড় পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অবতারের লীলাবিলাসের ইতিহাস। *রামায়ণ, মহাভারত,* এবং *অষ্টাদশ পুরাণ* হচ্ছে পুরাকালের ভগবানের বিভিন্ন অবতারের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনা সমন্বিত ইতিহাস। তাই বারবার পাঠ করলেও তা চিরকাল নতুনই থাকে। যেমন, যে কেউ *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* সারা জীবন ধরে বারবার পড়ে যেতে পারে, কিন্তু তবুও প্রত্যেকবারই তা তার কাছে নতুন বলে মনে হবে—প্রতিবারই নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। এই জড় জগতের সমস্ত খবরগুলি স্থাবর বা নিশ্চল, কিন্তু অপ্রাকৃত সংবাদ গতিশীল, ঠিক যেমন আত্মা গতিশীল আর জড় পদার্থ স্থাবর। যাঁরা অপ্রাকৃত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা বারবার সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেও ক্লান্ত হন না। জড়জাগতিক কার্যকলাপে অচিরেই অতৃপ্তির উদয় হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় সেবায় যুক্ত হলে কখনই যেন তৃপ্তি হয় না। উত্তম-শ্লোক বলতে সেই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের বর্ণনা করা হয়েছে, যা অজ্ঞানতা-প্রসূত নয়। জড় জগতের সমস্ত সাহিত্য তমোগুণ বা অজ্ঞানের প্রকাশ, কিন্তু অপ্রাকৃত শাস্ত্রগ্রন্থ সেরকম নয়। অপ্রাকৃত শাস্ত্রগ্রন্থ তমোগুণের অতীত, এবং তার বিষয়বস্তু যত বেশি করে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তার আলোকও তত উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তথাকথিত সমস্ত মুক্ত পুরুষেরা *অহং ব্রহ্মাস্মি, অহং ব্রহ্মাস্মি* বারবার উচ্চারণ করেও অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করতে পারে না। এই ধরনের কৃত্রিম ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূর্ণ নীরস, তাই যথার্থ রস আস্বাদন করার জন্য তারা *শ্রীমদ্ভাগবতের* শরণাপন্ন হয়। যারা ততটা ভাগ্যবান নয়, তারা পরার্থবাদ এবং লোকহিতৈষণা করতে শুরু করে। এর থেকে বোঝা যায় যে মায়াবাদী দার্শনিকেরা জড় স্তরে রয়েছে, কিন্তু *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* দর্শন হচ্ছে চিন্ময়।

শ্লোক ২০

কৃতবান্ কিল কর্মাণি সহ রামেণ কেশবঃ।
অতিমর্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥ ২০ ॥

কৃতবান্—করেছেন; **কিল**—যা; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **সহ**—সহিত; **রামেণ**—বলরাম; **কেশবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অতিমর্ত্যানি**—অলৌকিক; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গূঢ়ঃ**—প্রচ্ছন্ন; **কপট**—আপাতদৃষ্টিতে; **মানুষঃ**—মানুষ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে মনুষ্যরূপে লীলাবিলাস করেছেন, এবং এইভাবে তাঁর স্বরূপ গোপন রেখে তিনি বহু অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবানকে নরমূর্তিধারী এবং নরসুলভ গুণসম্পন্ন বলে কল্পনা করার যে মতবাদ, তা পরমেশ্বর ভগবান অথবা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে কখনই প্রযোজ্য হতে পারে না। আজকাল অনেকে প্রচার করছে যে, কৃচ্ছ্রসাধন এবং তপশ্চর্যার মাধ্যমে মানুষ ভগবান হয়ে যায়। এই মতবাদ আজকাল তো ভারতবর্ষে বেশ ভাল মতোই প্রচারিত হয়েছে। যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শাস্ত্র-প্রমাণে পরমেশ্বর ভগবান, তাই অনেক প্রতারক আজকাল তাদের মনগড়া সমস্ত ভগবানের অবতার সৃষ্টি করছে। এইভাবে মনগড়া ভগবানের অবতার সৃষ্টি করা আজকাল একটা সাধারণ ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে এই বাংলায় যে কোন মানুষ একটু ভেলকিবাজি দেখিয়ে অতি সহজে মূর্খ জনসাধারণের স্বীকৃতির মাধ্যমে ভগবান হয়ে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই ধরনের অবতার ছিলেন না। তিনি তাঁর আবির্ভাবের ক্ষণ থেকেই পরমেশ্বর ভগবান। তিনি তাঁর জন্মের পরেই তাঁর মাতা দেবকীর সম্মুখে তাঁর চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর তাঁর মায়ের অনুরোধে তিনি নরশিশুর রূপ ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর পিতা বসুদেবকে বলেছিলেন তাঁকে গোকুলে তাঁর আর এক ভক্তের কাছে নিয়ে যেতে, যেখানে তিনি নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মায়ের পুত্ররূপে লীলাবিলাস করেছিলেন। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণের অংশপ্রকাশ বলরামও বসুদেবের আর এক পত্নী রোহিণীর পুত্ররূপে লীলাবিলাস করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, তাঁর জন্ম এবং কর্ম হচ্ছে দিব্য এবং কেউ যদি সৌভাগ্যবশে সেই তত্ত্ব অবগত হতে পারেন, তা হলে তিনি এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যান। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্মের অপ্রাকৃতত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ন'টি স্কন্ধে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে এবং দশম স্কন্ধে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস বর্ণিত হয়েছে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করার মাধ্যমে পাঠকের কাছে ভগবানের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ভগবান তাঁর মায়ের কোল থেকেই তাঁর দিব্য কার্যকলাপ প্রদর্শন করতে থাকেন। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই অলৌকিক, তাঁর বয়স যখন মাত্র ৭ বছর তখন তিনি তাঁর বাঁ-হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের ওপর গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। তাঁর এই সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে সহজেই প্রমাণিত হয় যে তিনি যথার্থই পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু তবুও যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকার ফলে তাঁর পিতা-মাতা এবং অন্যান্য

আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে একজন সাধারণ নরশিশু বলেই মনে করতেন। তিনি যখনই কোন অসাধ্য কর্ম সাধন করতেন, তখন তাঁর পিতা-মাতা মনে করতেন যে ভগবানের কৃপায় অথবা দৈবাৎ যেন তা ঘটেছে। তাঁরা কখনই মনে করতে পারতেন না যে তাঁদের সেই ছোট্ট শিশুটি সেই অসম্ভব কার্য সম্পাদন করেছে; এবং তাঁদের পুত্রের প্রতি বাৎসল্য স্নেহে তাঁদের হৃদয় পূর্ণ করেই তাঁরা তৃপ্ত ছিলেন। তাই নৈমিষারণ্যের ঋষিরা তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে একজন মানুষের মতো বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ২১

কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ম্।
আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণা হরেঃ ॥ ২১ ॥

কলিম্—কলিযুগে; **আগতম্**—আগত হয়েছে; **আজ্ঞায়**—সে কথা জেনে; **ক্ষেত্রে**—এই স্থানে; **অস্মিন্**—এই; **বৈষ্ণবে**—বিশেষ করে বিষ্ণুভক্তদের জন্য; **বয়ম্**—আমরা; **আসীনা**—উপবিষ্ট; **দীর্ঘ**—বহুকাল ব্যাপী; **সত্রেণ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য; **কথায়াম্**—কথা; **সক্ষণা**—যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

কলিযুগের আগমন হয়েছে জেনে আমরা এই বৈষ্ণব-ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য এসে উপস্থিত হয়েছি; এখন আমাদের হরিকথা শ্রবণের অবসর লাভ হয়েছে।

তাৎপর্য

এই কলিযুগ সত্য, ত্রেতা অথবা দ্বাপর যুগের মতো আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী নয়। সত্য যুগে মানুষের আয়ু ছিল একশো হাজার বছর এবং তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে ধ্যান করার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করতেন। ত্রেতা যুগে মানুষের আয়ু যখন ছিল দশ হাজার বছর, তখন তাঁরা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে আত্মজ্ঞান লাভ করতেন। দ্বাপর যুগে মানুষের আয়ু যখন ছিল এক হাজার বছর, তখন তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করে আত্মজ্ঞান লাভ করতেন। কিন্তু এই কলি যুগে মানুষের আয়ু বড় জোর একশো বছর এবং তাও আবার নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা এবং প্রতিবন্ধকে পরিপূর্ণ; আর তাই এই যুগের আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নাম, যশ ও লীলা আদি শ্রবণ করা এবং কীর্তন করা। সেই সমস্ত মহর্ষিরা এই পন্থার প্রবর্তন করেছিলেন বৈষ্ণবক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে। তাঁরা এক হাজার বছর ধরে পরমেশ্বর ভগবানের কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। এই সমস্ত মহর্ষিদের এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে

সকলেরই বোঝা উচিত যে নিয়মিতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ এবং কীর্তন করাই হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র পন্থা। এ ছাড়া অন্য সমস্ত পন্থাই হচ্ছে কেবল সময়ের অপচয় মাত্র, কেন না তার ফলে কোন লাভই হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই ভাগবত-ধর্ম প্রচার করে গেছেন এবং তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, ভারত-ভূমিতে যারা মনুষ্য জন্ম লাভ করেছেন, তাঁরা যেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী, বিশেষ করে *ভগবদ্গীতার* বাণী সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্রচার করেন। কেউ যখন *ভগবদ্গীতার* বাণী যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন আত্মজ্ঞান লাভের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য তাঁরা *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করতে পারেন।

শ্লোক ২২

ত্বং নঃ সংদর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাম্।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবম্ ॥ ২২ ॥

ত্বম্—হে মহানুভব; **নঃ**—আমাদেরকে; **সন্দর্শিতঃ**—আমাদের দৃষ্টিপথে প্রেরিত; **ধাত্রা**—পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়; **দুস্তরম্**—দুর্লঙ্ঘ; **নিস্তিতীর্ষতাম্**—অতিক্রম করতে ইচ্ছুক; **কলিম্**—কলিযুগ; **সত্ত্ব-হরম্**—যা সৎ গুণাবলীকে ক্ষয় করে; **পুংসাম্**—মানুষের; **কর্ণধারঃ**—কর্ণধার; **ইব**—মতন; **অর্ণবম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

আমরা মানুষের সদ্‌গুণ অপহরণকারী কলিকাল-রূপ দুর্লঙ্ঘ সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছুক। সমুদ্রের পরপারে গমন করতে ইচ্ছুক মানুষের কাছে কর্ণধার সদৃশ আপনাকে বিধাতাই আমাদের কাছে পাঠিয়ে আপনার দর্শন লাভ ঘটিয়েছেন।

তাৎপর্য

এই কলি যুগ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করা। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর যুগের প্রভাবে মানুষ তার জীবনের এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছে। এই যুগে মানুষের আয়ু ক্রমে ক্রমে কমে আসবে। মানুষের স্মৃতি, সূক্ষ্ম অনুভূতি, বল, বীর্য এবং সমস্ত সদ্‌গুণ ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে। এই যুগের ভয়ঙ্কর অবস্থা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যে সমস্ত মানুষ আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় তাঁদের জীবন সার্থক করতে চান, তাদের পক্ষে এই যুগ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এই যুগের মানুষ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রচেষ্টায় এত ব্যস্ত যে তারা আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছে। উন্মাদের মতো তারা খোলাখুলিভাবেই বলে যে আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা করার কোন প্রয়োজন নেই; কারণ তারা বুঝতে পারে না যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন হচ্ছে আত্মজ্ঞান

লাভের দীর্ঘ যাত্রাপথের স্বল্পক্ষণ মাত্র। আধুনিক যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানুষকে কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে এবং যে কোনও চিন্তাশীল মানুষ যদি একটু চিন্তা করে দেখেন, তা হলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে এই যুগের শিশুরা কীভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে তথাকথিত শিক্ষার কসাইখানায় বলি হওয়ার জন্য প্রেরিত হচ্ছে। তাই শিক্ষিত মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে এই যুগ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং তাঁরা যদি কলিযুগ রূপী এই দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চান, তা হলে অবশ্যই তাঁদের নৈমিষারণ্যের ঋষিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীল সূত গোস্বামী অথবা তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধিকে তাঁদের তরণীর কর্ণধাররূপে গ্রহণ করতে হবে। সেই তরণীটি হচ্ছে *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* রূপী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী।

শ্লোক ২৩

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্মবর্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্মঃ কং শরণং গতঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রূহি—দয়া করে বলুন; **যোগ-ঈশ্বরে**—সমস্ত যৌগিক শক্তির ঈশ্বর; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণ; **ব্রহ্মণ্যে**—পরম ব্রহ্মে; **ধর্ম**—ধর্ম; **বর্মণি**—রক্ষক; **স্বাম্**—নিজের; **কাষ্ঠাম্**—ধাম; **অধুনা**—এখন; **উপেতে**—চলে যাওয়ায়; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **কম্**—কার; **শরণম্**—শরণ; **গতঃ**—গিয়েছে।

অনুবাদ

পরম ব্রহ্ম যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি তাঁর নিত্য ধামে অন্তর্ধান রূপ অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করলে সনাতন ধর্ম কার শরণাপন্ন হয়েছে, তা আমাদের বলুন।

তাৎপর্য

ধর্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রদত্ত পন্থা। যখন ধর্মের গ্লানি অথবা অবমাননা হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য আবির্ভূত হন। সে কথা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে। এখানে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সেই সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করছেন। এই প্রশ্নের উত্তর পরে দেওয়া হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে অপ্রাকৃত শব্দরূপে পরমেশ্বর ভগবানের অবতার, এবং তাই তা হচ্ছে দিব্য জ্ঞান এবং ধর্মনীতির পূর্ণ প্রকাশ।

ইতি—শ্রীমদ্ভাগবতের "ঋষিদের প্রশ্ন" নামক প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।